Through Knowledge Towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার “ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ” এর একটি আনুষঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধানেঃ
মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব
শিক্ষক, আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
নামঃ ফাতাহ ঝীম মীম
রোলঃ ২২৭০২০৩০৬

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge Towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতাহ ঝীম মীম, আইডিঃ ২২৭০২০৩০৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধানেঃ
মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব
শিক্ষক, আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ
নামঃ
প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব** উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য এই গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fatah Jeem Mim

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফাতাহ ঝীম মীম

আইডিঃ ২২৭০২০৩০৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচিপত্র

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।[সূরা তাকাসুর: ১]

أَلۡهَى يُلۡهِي শব্দের অর্থ হল গাফেল বা উদাসীন করে দেওয়া। تَكَاثُر অধিক কামনা করা বা প্রাচুর্য নিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা। এ কথাটি ব্যাপক; প্রাচুর্যে মাল-ধন, সন্তান-সন্ততি, সহযোগী-পৃষ্ঠপোষক, বংশ-গোত্র প্রভৃতি সবই শামিল। প্রত্যেক ঐ বস্তু যার প্রাচুর্য ও আধিক্য মানুষের প্রিয় এবং যা অধিকভাবে পাবার প্রচেষ্টা ও কামনা মানুষকে আল্লাহর আহকাম এবং আখেরাত হতে উদাসীন করে দেয়, তাই উদ্দেশ্য এখানে। এ স্থানে আল্লাহ তাআলা মানুষের সেই দুর্বলতাকে ব্যক্ত করেছেন, অধিকাংশ মানুষ সর্বযুগে যার শিকার হয়ে থাকে।[তাফসীর-আহসানুল বায়ান]

যারা শুধু দুনিয়ার ভোগবিলাসিতাকেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছে। এই সূরায় তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে জিজ্ঞাসার আওতায় আনা হবে। মূলত একটি সচ্ছল-শান্তিপূর্ণ জীবনের আকাঙ্খা করা শ্রেয়। কিন্তু এর মধ্যে অধিক পাওয়ার আশায় লোভের চাদরকে গুটিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়।

২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের প্রবাসী সংখ্যা ১ কোটি ৫৫ লাখ ১৩ হাজার ৪৬০ জন। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ছাড়াও আমাদের বাংলাদেশি ভাইবোনদের বড় একটি অংশ বাস করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অমুসলিম দেশে।

মুসলিম দেশ থেকে অমুসলিম দেশে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বসবাসকে ইসলাম কিভাবে দেখে? অমুসলিম দেশে কি ইচ্ছে হলেই যাওয়া যায়? কতটা প্রয়োজন থাকলে যাওয়া যায়? ভোগ বিলাসিতার জন্য কি যাওয়া যায়? নাকি যাওয়ার জন্য কোনো শর্ত আছে? যাওয়ার পরই বা সেখানে বসবাসের বিধি-বিধান গুলো কি? আমরা কি সেগুলো জানি?

প্রথম অধ্যায়
অমুসলিম দেশের পরিচয়

অমুসলিম দেশ হলো এমন একটি দেশ যেখানে ইসলামী আইন বা শাসনব্যবস্থা চালু নেই এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা অমুসলিম। এই ধরনের দেশগুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ বা অন্য কোনো ধর্ম বা বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

বৈশিষ্ট্য:

1. **ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা:** অধিকাংশ অমুসলিম দেশে শাসনব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ, যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য নেই।
2. **সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম জনগোষ্ঠী:** দেশের জনসংখ্যার প্রধান অংশ অন্য ধর্মের অনুসারী, যেমন খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি ইত্যাদি।
3. **ইসলামী আইন অনুপস্থিত:** আইন ও নীতি প্রণয়নে ইসলামী শরীয়াহর পরিবর্তে সাধারণ আইন বা অন্যান্য আইনি কাঠামো প্রয়োগ করা হয়।
4. **ধর্মীয় স্বাধীনতা:** বেশিরভাগ অমুসলিম দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা থাকে।

মহাদেশ অনুসারে ভাগ করে নিম্নে কিছু অমুসলিম দেশের তালিকা দেওয়া হলো:

এশিয়া:

- ভারত (হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- চীন (ধর্মনিরপেক্ষ, বৌদ্ধ ও নাস্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- জাপান (শিন্তো ও বৌদ্ধ প্রধান)
- নেপাল (হিন্দু প্রধান)
- থাইল্যান্ড (বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- শ্রীলঙ্কা (বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ)

ইউরোপ:

- ফ্রান্স (ধর্মনিরপেক্ষ, খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)

- জার্মানি (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- ইতালি (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- রাশিয়া (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- যুক্তরাজ্য (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- স্পেন (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)

উত্তর আমেরিকা:

- যুক্তরাষ্ট্র (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- কানাডা (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- মেক্সিকো (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)

দক্ষিণ আমেরিকা:

- ব্রাজিল (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- আর্জেন্টিনা (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- চিলি (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)

আফ্রিকা:

- দক্ষিণ আফ্রিকা (ধর্মনিরপেক্ষ, খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- কেনিয়া (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- উগান্ডা (খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)

ওশেনিয়া:

- অস্ট্রেলিয়া (ধর্মনিরপেক্ষ, খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)
- নিউজিল্যান্ড (ধর্মনিরপেক্ষ, খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ)

এই দেশগুলোতে মুসলমানরা সাধারণত সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করে এবং সেখানে ইসলামী আইন বা শাসনব্যবস্থা প্রচলিত নয়।

মুসলমানের সংজ্ঞা

আরবি **مسلم** শব্দটির অর্থ: স্ব ইচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। মুসলমান বা মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সংক্ষেপে মুসলমানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1. আল্লাহর প্রতি ঈমান:

একজন মুসলমান একমাত্র আল্লাহকে উপাস্য ও সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করেন।

2. নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান:

ইসলামের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মান্য করেন।

3. ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ:

শাহাদাহ: আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল — এই সাক্ষ্য দেওয়া।

সালাত: দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।

সাওম: রমজান মাসে রোজা রাখা।

যাকাত: সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দান করা।

হজ্ব: সামর্থ্যবান মুসলমানদের জীবনে একবার মক্কায় হজ্ব পালন করা।

4. কুরআন ও হাদিস মেনে চলা:

একজন মুসলমান পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর বাণী এবং হাদিসকে নবীর শিক্ষা হিসেবে মেনে চলেন।

5. আখিরাতে বিশ্বাস:

পরকালীন জীবনে পুনরুত্থান, বিচার, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস রাখেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান ও বসবাসের বিধান

পৃথিবীতে বহু মুসলমান বিভিন্ন অমুসলিম দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করছেন। বর্তমানে কেবল ভারতেই মুসলিমদের সংখ্যা ২০ কোটির ওপরে। অর্থাৎ,ভারত হলো সর্বোচ্চসংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এছাড়া চীনে আড়াই কোটি, রাশিয়ায় ১ কোটি ৪০ লাখ, ইউরোপে ১ কোটি ৮০ লাখ এবং আমেরিকায় ৮০ লাখ মুসলিম বসবাস করছেন। এভাবে আফ্রিকার দেশসমূহেও বাস করছেন কোটি কোটি মুসলমান। তানজানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এশিয়ার দেশসমূহ-যেমন সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ইত্যাদিতেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলমান বাস করছেন।

অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের বসবাসের মাসাআলায় শরয়ী প্রথম প্রশ্ন হলো, সেখানে অবস্থান ও বসবাস সম্পর্কে শরিয়ত কী বলে, মুসলিম দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকা এবং সেখানকার আইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো কি জায়িজ?

এ মাসআলার শরয়ী বিধান জানতে দুটি ভিত্তির ওপর চোখ রাখা আবশ্যক:

১. যে-অমুসলিম দেশে কোনো মুসলিম থাকছেন বা থাকতে চান, তাঁর জন্য সেখানকার আইনি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কেমন হবে। অবস্থার পার্থক্যের কারণে বিধানেও পার্থক্য ঘটবে।

২. সেখানে বসবাসের কারণ কী। কারণের পার্থক্যের জন্য বিধানও ভিন্ন হবে।

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার

ফকিহরা অমুসলিম দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা বিধান বর্ণনা করেছেন। ফিকহের গ্রন্থাদিতে এ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা এখানে এ তিনটি ভাগের আওতায় আসা মাসআলাগুলোর সারাংশ তুলে ধরব।

ক. এমন অমুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিমদের পক্ষে বাস করা খুবই কঠিন, যেখানে একজন মুসলমানের নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের দ্বীন, ইমান, জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তার

কোনো নিশ্চয়তা নেই, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, যেখানকার পরিবেশ হিজরত-পূর্বকার মক্কিজীবনের মতোই ইসলামবিরুদ্ধ।
এমন দেশে যাওয়া বা সেখানে বাস করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িজ। যে সেখানে আগে থেকে বাস করছে, কোনো মুসলিম বা নিরাপদ দেশে হিজরত করার সুযোগ থাকলে তার অবশ্যই তা করা উচিত।[1]

দীনের জন্য শঙ্কাকুল বা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাস না করে সেখান থেকে হিজরত করতে হবে, এই বক্তব্যের উৎস হলো মহান আল্লাহর বাণী:

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ
اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা বলে, 'আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' এদেরই আবাসস্থল হলো জাহান্নাম এবং তা কতই-না মন্দ স্থান! [সুরা নিসা: ৯৭]

এ আয়াতে এমন অঞ্চলে বাস করাকে জুলুম ও কঠিন গুনাহ বলা হয়েছে, যেখানে নিজের ধর্ম ও ইমান রক্ষা করে চলা যাবে না। এটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের সেখান থেকে বেরোনোর এবং উপযুক্ত কোনো স্থানে বসবাসের সামর্থ্য রয়েছে। অন্যথায় এমন রাষ্ট্রে যাওয়া ও বাস করা কীভাবে জায়িজ হতে পারে!

খ. এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্র যেখানে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নেই, মুসলমানরা যেখানে বাস করেন দুর্বল সংখ্যালঘু হয়ে এবং মানহানির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। কিন্তু হিজরত করার মতো স্থান না থাকলে বা কোনো মুসলমান অন্যত্র সফরের ব্যয় বহনে সমর্থ না হলে সেখানে থেকে যাওয়াটা দোষের নয়। ফকিহরা একমত যে, এমন মুসলিমদের ওপর হিজরত ওয়াজিব নয়। এমন রাষ্ট্রে বসবাস তাদের জন্য গুনাহের কারণও নয়।[2] এ বিধানের উৎস হলো উল্লিখিত আয়াতের পরের আয়াত:

---

[1] মুগনিল মুহতাজ, শিরবিনি: ৬/৫৪; আল-উম্ম, ইমাম শাফিয়ি: ২/১৬৯; আল-হাবিল কাবির, মাওয়ারদি: ১৮/৩১১; রাওজাতুত তালিবিন, আল্লামা নবিব: ৭/৪৭৪।

[2] কাশশাফ: ১/৫৫৫।

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ (٩٨)

তবে যেসব অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না [সুরা নিসা: ৯৮]

এ আয়াতে দুর্বল ও নিরুপায় লোকেদের হিজরতের বিধানের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ছাড় শুধু এমন সময়ের জন্য, যখন তাদের পক্ষে হিজরতের কোনো উপায়ই থাকে না।[3]

গ. এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিমদের জন্য সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস আশঙ্কাজনক নয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাও আছে। নিজের বা নিজের বংশধরদের ইমান ও ইসলাম যেখানে রক্ষা করে চলা সম্ভব।

এমন রাষ্ট্রে বসবাসের ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। হানাফি, হাম্বলি আলিমদের ও শাফিয়িদের প্রধান অভিমত এটি যে এমন রাষ্ট্রে বসবাস করা জায়িজ আছে। বসবাসরত মুসলিমদের জন্য সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব নয়।

[3] আহকামুল কুরআন, জাসসাস ৩/২২৮; ফাতহুল উলা: ৭/৩৭৫-৩৭৬।

অমুসলিম দেশে অবস্থানের শর্ত

অমুসলিমদের দেশে বসবাসের বিধান সংক্রান্ত

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য, বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও উসূলবিদ, আশ-শাইখ, আল-‘আল্লামাহ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—

“অমুসলিম-কাফিরদের দেশে বসবাস করা মুসলিমের দ্বীন, চরিত্র, চলাফেরা ও শিষ্টাচারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। আমরা নিজেরা এবং আমরা ছাড়া আরও অনেকেই এটা প্রত্যক্ষ করেছি যে, যারা সেখানে বসবাসের জন্য গিয়েছে, তাদের অনেকেই বিপথগামী হয়েছে, ফলে তারা সেখানে যা নিয়ে গিয়েছিল, তার বিপরীত জিনিস নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। তারা সেখান থেকে পাপাচারী হয়ে এসেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ নিজের দ্বীন পরিত্যাগ করে সকল ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস (নাস্তিকতা) নিয়ে ফিরে এসেছে। আল-‘ইয়াযু বিল্লাহ (আল্লাহ’র কাছে এ থেকে পানাহ চাই)। এক পর্যায়ে তারা নিরেট অবিশ্বাসের দিকে চলে যায় এবং ধর্ম ও পূর্ববর্তী-পরবর্তী ধর্মপালনকারীদের দিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ শুরু করে। তাই সকলের জন্য এ থেকে সতর্ক থাকা এবং এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক বিষয়ে নিপাতিত হওয়া থেকে নিরোধকারী শর্ত আরোপ করা বাঞ্ছনীয়।”

কাফির রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য অবশ্যই দুটো প্রধান শর্ত পূরণ হতে হবে। যথা:

প্রথম শর্ত: বসবাসকারীকে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তার এমন ‘ইলম, ঈমান ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে, যা তাকে দ্বীনের ওপর অটল থাকার মতো এবং বক্রতা ও বিপথগামিতা থেকে বেঁচে থাকার মতো আত্মবিশ্বাসের জোগান দেয়। আর কাফিরদের প্রতি তার অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকতে হবে। অনুরূপভাবে কাফিরদের সাথে মিত্রতা ও তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। কেননা তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিপন্থি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَا تَجِدُ قَوۡمًا يُّؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ يُوَآدُّوۡنَ مَنۡ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَلَوۡ كَانُوۡۤا اٰبَآءَهُمۡ اَوۡ اَبۡنَآءَهُمۡ اَوۡ اِخۡوَانَهُمۡ اَوۡ عَشِيۡرَتَهُمۡؕ

"তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো জাতিকে পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে; যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, কিংবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।" [সূরাহ মুজাদালাহ: ২২]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ (٥١) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَـٰدِمِينَ ۚ (٥٢)

"হে মু'মিনগণ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে অবশ্যই তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, 'আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে।' অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে।" [সূরাহ মা'ইদাহ: ৫১-৫২]

আল্লাহর শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ। কেননা তাদেরকে ভালোবাসলে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করা এবং তাদের অনুসরণ করা, কিংবা কমপক্ষে তাদের কর্মের বিরোধিতা না করা—জরুরি হয়ে যায়। নবী ﷺ বলেছেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ "মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবে।" [সাহীহ বুখারী, হা/৬১৬৯; সাহীহ মুসলিম, হা/২৬৪০]

দ্বিতীয় শর্ত: নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, বসবাসকারী ব্যক্তি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ইসলামের নিদর্শনাবলি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। নামাজ, জুমু'আহ ও জামা'আত—যদি তার সাথে জামা'আতে নামাজ ও জুমু'আহ প্রতিষ্ঠা করার মতো কেউ থেকে থাকেন—প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না।

অনুরূপভাবে যাকাত, রোজা, হজ্ব ও অন্যান্য শার'ঈ নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। যদি এসব কাজ করার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে তখন হিজরত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে বসবাস করা জায়েজ হবে না।

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) "মুগনী" গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় হিজরতের ব্যাপারে মানুষের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "যার ওপর হিজরত করা ফরজ: যে ব্যক্তির হিজরত করার মতো সক্ষমতা আছে, আর তার জন্য স্বীয় দ্বীনকে প্রকাশ করা এবং কাফিরদের মধ্যে বাস করে দ্বীনের ওয়াজিব বিষয়াদি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না, সে ব্যক্তির ওপর হিজরত করা ওয়াজিব। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম।' ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?' সুতরাং ওরাই তারা, যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।" (সূরাহ নিসা: ৯৭)

এটা হলো কঠিন হুঁশিয়ারি, যা হিজরতের আবশ্যকীয়তা প্রমাণ করে। কেননা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয় পালন করা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব; এটি এমন একটি বিধান, যা আবশ্যকীয় কর্মাবলিকে পূর্ণতা দান করে। আর যা ব্যতিরেকে ওয়াজিব কাজ পূর্ণ হয় না, সেটাও ওয়াজিব।" [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

উল্লিখিত প্রধান শর্ত দুটি পূরণ হওয়ার পর কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করার বিষয়টিকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

যেসব কারণে অমুসলিম দেশে অবস্থান করা যাবে

এ মাসআলার দুটি দিক রয়েছে। অমুসলিম দেশে বসবাসের কারণ ও প্রেরণাদায়ক বিষয়গুলো কী কী? কারণ বদলের ফলে বিধানেও পরিবর্তন ঘটবে। অনেক কারণ আছে, যেজন্য লোকেরা অমুসলিম দেশের দিকে পা বাড়ায়।

প্রথম প্রকার: দাওয়াতি কাজে সফর ও বসবাস

ইসলামের দিকে দা'ওয়াত এবং ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য বসবাস করা। এটি এক প্রকার জিহাদ। সক্ষম ব্যক্তির ওপর এ কাজ করা ফরজে কিফায়াহ।

তবে শর্ত হলো—দা'ওয়াত বাস্তবায়িত হতে হবে এবং দা'ওয়াত প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকা যাবে না। কেননা ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেওয়া দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই রাসূলগণের পথ। নাবী ﷺ সর্ব জায়গা ও সর্ব সময়ে ইসলামের তাবলীগ (প্রচার) করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ اَيَةً "আমার পক্ষ হতে (মানুষের কাছে) একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও।" [সাহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১]

দ্বিতীয় প্রকার: মুসলিমদের গুপ্তচর

কাফিরদের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য এবং তারা যে ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ, বাতিল ইবাদত, নষ্ট চরিত্র ও নৈরাজ্যপূর্ণ চলাফেরার ওপর রয়েছে—তা জানার জন্য সেখানে অবস্থান করা। যাতে করে মানুষকে তাদের মাধ্যমে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া থেকে সতর্ক করা যায়, আর যারা তাদেরকে ভালো মনে করে, তাদের কাছে ওদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা যায়। এ ধরনের বসবাসও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এর মাধ্যমে কুফর ও কাফিরদের থেকে সতর্ক করা হয়, যা ইসলাম ও তার আদর্শের প্রতি উৎসাহপ্রদানের মতো বিষয়কে ধারণ করে। কেননা কুফরির অনিষ্টতাই ইসলামের সঠিকতার প্রমাণ। তাইতো বলা হয়, "বস্তুর প্রকৃতত্ব তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়।"

কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত আছে। আর তা হলো—ওই কাজের ভালো ফলের চেয়ে বড়ো কোনো ক্ষতির আনয়ন ব্যতিরেকেই উক্ত কাজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে হবে। যদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হয়, তথা কাফিররা যে মতাদর্শের ওপর রয়েছে তা প্রচার করতে এবং তা থেকে সতর্ক করতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে অবস্থান করার কোনো ফায়দা নেই। আবার যদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার সাথে সাথে তার চেয়ে বড়ো কোনো ক্ষতি অর্জিত হয়, তাহলে

উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। যেমন: কাফিররা প্রচারকারী ব্যক্তির কাজের মোকাবেলায় ইসলামকে এবং ইসলামের রাসূল ও ইমামগণকে গালিগালাজ করা শুরু করল (তাহলে উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক)।

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ١٠٨

“আর তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করে, ফলে তারা বিদ্বেষ ও অজ্ঞতাবশত গালি দিবে আল্লাহকে। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছি। তারপর তাদের রবের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।” [সূরাহ আন‘আম: ১০৮]
এই প্রকারটি কাফির রাষ্ট্রে মুসলিমদের গুপ্তচর হিসেবে অবস্থান করার মতো। যাতে সে জানতে পারে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা কী গুপ্ত ষড়যন্ত্র করছে, ফলে তাদের থেকে মুসলিমরা সতর্ক থাকতে পারে। যেমন নাবী ﷺ খন্দক যুদ্ধে হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) কে মুশরিকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাদের খবর জানার জন্য।

তৃতীয় প্রকার: রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং কাফির রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখতে সেখানে বসবাস করা। যেমন: দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ। এক্ষেত্রে যে কাজের জন্য এখানে অবস্থান করতে হচ্ছে, সে কাজের বিধান যা, এখানে বসবাসের বিধানও তা। উদাহরণস্বরূপ কোনো কালচারাল অ্যাটাশে ছাত্রদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শিষ্টাচার পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেখানে বসবাস করছেন। তাঁর সেখানে বসবাস করার ফলে অর্জিত হয় বিরাট কল্যাণ এবং নিশ্চিহ্ন হয় বড়ো ধরণের অকল্যাণ।

চতুর্থ প্রকার: ইলম অর্জনের জন্য

পড়াশোনার জন্য বসবাস করা প্রয়োজন অনুযায়ী বৈধ। কিন্তু এটি বসবাসকারীর দ্বীন ও আখলাকের জন্য পূর্বোক্ত বিষয়ের চেয়েও বিপজ্জনক ও ভয়াবহ। কেননা এতে ছাত্র নিজের নিচু

মর্যাদা এবং তার শিক্ষকদের উঁচু মর্যাদা অনুভব করে। ফলে সে তাদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাদের মতাদর্শ ও লাইফ স্টাইলে পরিতুষ্ট হয়। এক পর্যায়ে সে তাদের অনুকরণ শুরু করে। আল্লাহ যাকে হেফাজত করতে চান, সে ছাড়া কেউ এ থেকে বাঁচতে পারে না; আর তাদের (বেঁচে যাওয়া ছাত্রদের) সংখ্যা খুবই নগন্য।

এতদ্ব্যতীত ছাত্র স্বীয় শিক্ষকের কাছে নিজের প্রয়োজন অনুভব করে, যা তাকে (কাফির) শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং শিক্ষকের ভ্রষ্ট মতাদর্শের ব্যাপারে তাঁর মোসাহেবি করার দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়াও ছাত্র যে ছাত্রাবাসে থাকে, সেখানে তার সহপাঠীরাও থাকে। তাদের মধ্য থেকে সে কতিপয়কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ভালোবাসে এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে। এই প্রকার বসবাসের ভয়াবহতার কারণে এক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্কে থাকা ওয়াজিব। তাই এক্ষেত্রে প্রধান শর্ত দুটোর পাশাপাশি আরও কিছু শর্ত যুক্ত হয়।

যথা:

১ম শর্ত: ছাত্রকে বিবেকগত পক্কতার দিক থেকে উঁচু স্তরের হতে হবে, যার মাধমে সে কল্যাণকারী ও অকল্যাণকারীকে আলাদা করতে পারবে এবং অদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। পক্ষান্তরে কমবয়সী এবং কম বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদেরকে কাফির রাষ্ট্রে পাঠানো তাদের দ্বীন, চরিত্র ও শিষ্টাচারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। এরপর এটা তাদের জাতির লোকের জন্যও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন তারা নিজেদের জাতির কাছে ফিরে যায় এবং তাদের মধ্যে ওই বিষ উৎক্ষেপণ করে, যা সে ওই কাফিরদের নিকট থেকে পান করে এসেছে। যেমনটি ইতঃপূর্বে ঘটেছে এবং বাস্তবতাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। ওই সকল ছাত্রদের অনেকেই যা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল, তার বিপরীত বিষয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। তারা তাদের ধার্মিকতা, চরিত্র ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বিপথগামী হিসেবে ফিরে এসেছে। আর এসব ক্ষেত্রে তারা নিজেরা এবং তাদের সমাজ অর্জন করেছে ভয়াবহ অনিষ্ট, যা এখন সুবিদিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে সেখানে পড়তে পাঠানো মূলত হিংস্র কুকুরের কাছে ভেড়ী বা দুম্বী পেশ করার নামান্তর।

২য় শর্ত: ছাত্রের এমন শার‘ঈ ‘ইলম থাকতে হবে, যার দ্বারা সে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং হক দিয়ে বাতিলকে প্রতিহত করতে পারে। যাতে করে কাফিররা যে বাতিল মতাদর্শের ওপর আছে, সে তার দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে ওই মতাদর্শকে হক মনে করে না বসে, অথবা তা তার কাছে গোলমেলে হয়ে না যায়, কিংবা তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ না হয়। অন্যথায় সে দিশেহারা হয়ে যাবে, কিংবা বাতিলের অনুসরণ করতে শুরু করবে। হাদীসে বর্ণিত দু‘আয় বলা হয়েছে,

اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علي فأضل

“হে আল্লাহ, আপনি আমার কাছে হককে হক হিসেবেই দেখান এবং আমাকে তা অনুসরণ করার সামর্থ্য দিন। আপনি আমার কাছে বাতিলকে বাতিল হিসেবেই দেখান এবং আমাকে তা বর্জন করার সামর্থ্য দিন। আর আপনি বাতিলকে আমার ওপর গোলমেলে করে তুলিয়েন না, যার দরুন আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই!”

৩য় শর্ত: ছাত্রের এমন ধার্মিকতা থাকতে হবে, যা তাকে হেফাজত করবে এবং যার মাধ্যমে সে কুফর ও পাপাচারিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। ধর্মপালনে দুর্বল ব্যক্তির জন্য ওখানে বসবাস করা নিরাপদ নয়, তবে আল্লাহ যাকে নিরাপদ রাখতে চান তার কথা স্বতন্ত্র। কেননা ওখানে প্রতিরোধকারী দুর্বল, আর আক্রমণকারী শক্তিশালী। ওখানে কুফর ও পাপাচারিতার অসংখ্য শক্তিশালী মাধ্যম রয়েছে। যখন এসব মাধ্যম কোনো দুর্বল প্রতিরোধকারীর সম্মুখে এসে পড়ে, তখন সেগুলো তাদের কাজ করে চলে যায়।

৪র্থ শর্ত: সে যে বিদ্যা অর্জনের জন্য সেখানে বসবাস করছে, সেই বিদ্যার প্রয়োজন থাকতে হবে। যেমন ওই বিদ্যা অর্জনের মধ্যে মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত থাকা এবং উক্ত বিদ্যার অস্তিত্ব মুসলিমদের দেশে না থাকা। কিন্তু তা যদি অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়, কিংবা সেই বিদ্যার অস্তিত্ব মুসলিম দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকে, তাহলে উক্ত বিদ্যা অর্জনের জন্য কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করা জায়েজ নয়। যেহেতু সেখানে বসবাসের মধ্যে রয়েছে দ্বীন ও আখলাকের ক্ষতি এবং কোনো ফায়দা ছাড়াই বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয়।

৫ম শর্ত: এই জ্ঞান শরীয়ত ও ইসলামী বিধানের বিপরীত হতে পারবে না। সেখানে ছাত্রদের ধর্মীয় গবেষণার ব্যবস্থা থাকতে হবে

পঞ্চম প্রকার: রাজনৈতিক নিরাপত্তা অর্জন

কোনো কোনো সময় মুসলিমদের জন্য নিজ দেশে বসবাস করা তার জানমাল ও মর্যাদার জন্য আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। ইসলামি রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তার অধিকার হরণ করা হয়, তার ওপর জুলুম করা হয়। সে যেন নিজের জানমাল নিরাপদ রাখতে পারে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে, এজন্য অমুসলিম দেশে তার বসবাসের অনুমতি রয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচ্য:

১. এমন দেশ নির্বাচন করতে হবে, যেখানে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে সে ইসলামের বিধানাবলির ওপর আমল করতে পারে।

২. মুসলিম দেশে তার সঙ্গে জুলুম-অত্যাচারের সীমা চূড়ান্ত পর্যায়ের হতে হবে। এমন হতে হবে যে, তা দূর করার কোনো উপায় নেই। উপরন্তু কোনো মুসলিম দল বা দেশ তাকে সাহায্য-সহযোগিতার আশাও দেয়নি।

৩. অমুসলিমদের এমন কোনো কাজে সাহায্য করতে পারবে না, যা মুসলিম আমজনতার জন্য ক্ষতিকর।[4]

এ ব্যাপারে প্রিয় নবি-এর বাণীতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাণীটি হলো:

مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَإِنْ كَانَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ

যে নিজের ধর্ম পালনের জন্য এক জায়গা থেকে পালিয়ে অন্য জায়গায় যায় আর এ কারণে এক বিঘত জমিও হারায়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[5]

এর আরেকটি দলিল হল, সাহাবাগণ মক্কায় কুরাইশদের কাছে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তখন হাবশায় কাফেরদের রাজত্ব চলছিল। তখন সাহাবায়ে কেরাম সেখানে অবস্থান করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী সেখানে অবস্থান করেছিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) খায়বার যুদ্ধের সময় ফিরে এসেছিলেন। তখন ছিল হিজরী সপ্তম বছর। আর মানুষের আত্মিক অধিকার হল যে, সে তার নফস বা আত্মাকে যে কোন ধরনের অন্যায় ও জুলুম থেকে নিরাপদে রাখবে। সুতরাং যদি সে কোন কাফের রাষ্ট্র ছাড়া নিজের জন্য কোন নিরাপদ স্থান না পায় তাহলে তার জন্য সেখানে হিজরত করাতে কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হবে এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

---

[4] আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন: ৫/৩৫০; আহকামুল কুরআন: ১/৪৮৫: আল-মুহাল্লা: ১১/২০০।

[5] আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন: ৫/৩৪৭।

ষষ্ঠ প্রকার: উপার্জনের উদ্দেশ্যে বসবাস

কোনো ব্যক্তি যদি মুসলিম দেশে হন্যে হয়ে খোঁজাখোঁজি করা সত্ত্বেও জীবিকা উপার্জনের কোন সোর্স ব্যবস্থা করতে না পারে, এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়, এমন পরিস্থিতিতে যদি কোনো অমুসলিম দেশে জায়েয কোনো চাকরি বা ব্যবসা পেয়ে যায়, তাহলে দু'টি শর্ত সাপেক্ষে তার জন্য সেখানে যাওয়া এবং বসবাস করা জায়েয হবে।

যথাঃ-

এক. সেখানে আমলী জিন্দিগী তথা, ইসলামী বিধি-বিধান পরিপালনে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকতে হবে।

দুই. সেখানকার প্রচলিত অশ্লীলতা, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে।

কেননা, হালাল জীবিকা অন্বেষণ করাও ফরজ ইবাদতসমূহের পর একটি অন্যতম ফরজ কাজ। আর জীবিকা উপার্জনের জন্য ইসলাম কোনো জায়গাকে নির্দিষ্ট করে দেয়নি। বরং জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাপক অনুমতি রয়েছে যে, যেখান থেকে ইচ্ছা করবে সেখান থেকে জীবিকা উপার্জন করতে পারবে।

যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ لَـكُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا فِىۡ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ‌ؕ وَاِلَيۡهِ النُّشُوۡرُ ١٥

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন সুগম, সুতরাং তোমরা তাতে ভ্রমণ কর এবং তার দেয়া জীবিকা থেকে আহার কর, তোমাদেরকে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে"। (সূরা মুল্ক ঃ আয়াত, ১৫)

তবে বিনা প্রয়োজনে সেখানে চাকরী এবং বসবাসের কোনো অনুমিত শরীয়তে নেই।

যেমন,আবু দাঊদ শরীফে হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন :

من جامع المشركين وسكن معه، فانه مثله –

"যে ব্যক্তি অমুলিমদের সাথে চলাফেরা করবে এবং তাদের সাথে বসবাস করবে, সেও তাদের অনুরূপ হবে"। (আবু দাঊদ, কিতাবুদ্দাহায়া)

হযরত জারীর ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন :

انا بريئ من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين، قالوا يا رسول الله ! لم؟ قال لا ترئ اي نارهما

"সেসব মুসলমানদের ব্যাপারে আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই, যারা অমুসলিমদের সাথে বসবাস করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেন, ইসলামের অগ্নি এবং কুফরীর অগ্নি উভয়টি এক সাথে থাকতে পারেনা। কোনটি মুসলমানের

আগুন, কোনটি অমুসলিমের আগুন তোমরা তা পার্থক্য করতে পারবেনা” (বিস্তারিত জানতে মুফতী তাকী উসমানী রাহ কর্তৃক লিখিত-ফেকহী মাক্কালাত, ১/২৪৩-২৭৫; দেখা যেতে পারে)

সপ্তম প্রকার:চিকিৎসার উদ্দেশ্যে

কেউ অসুস্থ হলে এবং মুসলিম দেশে উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে অমুসলিম দেশে অবস্থান করে চিকিৎসা নিতে পারবে।[6]

অষ্টম প্রকার: পর্যটনের উদ্দেশ্যে সাময়িক অবস্থান

পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে সাময়িক অবস্থান করা যায়। মুসলিম ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অমুসলিম দেশে আনন্দ-ভ্রমণ করা, সফর করা বা সেখানে অবস্থান করা অধিকাংশ আলিমের মতে জায়িজ।[7] কারণ সফর বা ভ্রমণ মূলত নাজায়িজ নয়, বরং উপদেশ-নসিহত লাভের সুযোগের কারণে প্রশংসিত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর এমন অনেক কুদরত ও মহিমা সামনে আসে, যা দ্বারা মানুষের ইমান বৃদ্ধি পায়। পৃথিবী যে নশ্বর, এ ধারণা পাকাপোক্ত হয়। কোনো কোনো সময় সফর থেকে মানুষের আধ্যাত্মিকতা[8] ও সুলুকের[9] নানা স্তর ও মাকাম অতিক্রমের সৌভাগ্য হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন:

قُلۡ سِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَانْظُرُوۡا كَيۡفَ بَدَاَ الۡخَـلۡقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنۡشِئُ النَّشۡاَةَ الۡاٰخِرَةَ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ‌ ۚ‏ ٢٠

বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো কীভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন। তারপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [সুরা আনকাবুত : ২০।

এমন সফর ও ভ্রমণে ব্যাপক অর্থে অমুসলিম দেশও অন্তর্ভুক্ত। এটা এজন্য যে, সমগ্র দুনিয়া আল্লাহর। তিনি নিজের ভূমি যাকে ইচ্ছা তাকে দেবেন। তবে সফর ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে গমনকারীদের জন্য নিচের বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক:

১. এমন স্থান ও এলাকায় যাবেন, যেখানে শরয়িভাবে জানা-অজানা নাজায়িজ বিষয়ে লিপ্ত হতে ভয় নেই।

২. অপচয় ও সময় নষ্ট করা থেকে বাঁচতে হবে।

---

[6] ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল লিল মুসাফিরিন: ৩৯।

[7] আহকামুল কুরআন: ১১/৪৮৬; আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন: ৫/৩৫০; আল-আকাল্লিয়াতুল মুসলিমা: ৬৭।

[8] নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখে পবিত্র জীবনযাপন করাকে আধ্যাত্মিকতা বা আত্মশুদ্ধি বলে।- অনুবাদক।

[9] আত্মশুদ্ধি শেখার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সে পথে চেষ্টা ও মুজাহাদা করাকে 'সুলুক' বলে।- অনুবাদক।

৩. ভ্রমণের উদ্দেশ্য থাকতে হবে সৎ। যেমন আল্লাহর পথে আহ্বান করা, মুসলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, কোনো তালিমি তথা শিক্ষা-সেমিনারে উপস্থিত হওয়া বা আল্লাহর নিদর্শনাবলি পরিদর্শন করা ইত্যাদি।

নবম প্রকার: অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব অর্জন

স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অবস্থান করা পূর্বের প্রকারগুলোর চেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়াবহ। কেননা এতে অনেক ক্ষতি রয়েছে। যেমন: কাফিরদের সাথে পূর্ণরূপে সংমিশ্রিত হওয়া, এবং তার এই উপলব্ধি হওয়া যে, সে একজন নাগরিক, যে কি না দেশ যা দাবি করে—তথা ভালোবাসা, মিত্রতা প্রভৃতি—তা মেনে চলে। এছাড়াও এতে রয়েছে কাফিরদের দল ভারি করার মতো ক্ষতিকর বিষয়। এরকম ব্যক্তি নিজের পরিবারকে কাফিরদের মধ্যে লালনপালন করে। ফলে তার পরিবারের সদস্যরা কাফিরদের চরিত্র ও সংস্কৃতির অনেক বিষয় গ্রহণ করে এবং কখনো কখনো ‘আক্বীদাহ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণও করে!

একারণে হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ “যে ব্যক্তি কোনো মুশরিকের সাহচর্যে থাকে এবং তার সাথে বসবাস করে, সে মূলত তারই মতো।” [আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৭; সনদ: সাহীহ (তাহক্বীক্ব: আলবানী)]

এই হাদীস যদিও দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে, তথাপি এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আর তা হলো—একত্রে বসবাস একই রকম হওয়ার দিকে আহ্বান করে।

ক্বাইস বিন আবূ হাযিম থেকে বর্ণিত, তিনি জারীর বিন ‘আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নপবী ﷺ বলেছেন, أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا “আমি ওই সকল মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহ’র রাসূল, এরূপ কেন?’ তিনি বললেন, ‘যাতে করে তাদের দুজনের আগুনকে এক দৃষ্টিতে দেখা না যায়’।” [আবূ দাঊদ, হা/২৬৪৫; তিরমিযী, হা/১৬০৪; সনদ: সাহীহ (তাহক্বীক্ব: আলবানী)]

অধিকাংশ রাবি (বর্ণনাকারী) হাদীসটিকে ক্বাইস বিন আবূ হাযিম কর্তৃক নাবী ﷺ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, “আমি মুহাম্মাদকে—অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে—বলতে শুনেছি, সঠিক কথা হলো নাবী ﷺ থেকে ক্বাইসের বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল।”

তাহলে কীভাবে একজন মু’মিনের অন্তর কাফিরদের দেশে বসবাস করার প্রতি সম্মত হতে পারে? অথচ সেসব দেশে কুফরের নিদর্শনাবলি প্রকাশমান, সেসব দেশে শাসন করা হয় আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের আইন ব্যতীত অন্য আইন দিয়ে! আর সে তার দু চোখ দিয়ে এসব দেখে, দু কান দিয়ে এসব শোনে, এবং তাতে সম্মত হয়। এমনকি সে ওই সকল দেশের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। সেসব দেশে সে স্বীয় পরিবার ও সন্তানসন্ততি নিয়ে বসবাস করে এবং সেসব দেশে শান্তি খুঁজে পায়, যেমনভাবে মুসলিমদের দেশে থেকে প্রশান্তি লাভ করা হয়। অথচ সেখানে বসবাস করা তার নিজের জন্য এবং তার পরিবারপরিজন ও সন্তানসন্ততির দ্বীন ও আখলাকের জন্য খুবই বিপজ্জনক।[10]

অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ মূলত জায়িজ, তবে স্থান, কাল ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে হুকুমের মধ্যেও পার্থক্য হতে পারে। সমকালীন অধিকাংশ আলিম এই মতের পক্ষে। এর সিদ্ধান্তদাতা কয়েকজন আলিম হলেন আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারজাবি, আল আজহারের আল-কুল্লিয়াতুশ শারইয়া ওয়াল-কানুনের রুকন ড. মুহাম্মাদ রাফাত উসমানি, ড. ওহবা জুহাইলি এবং আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি।৬৪
বুহুসুন ফি কাজায়া ফিকহিয়া মুআসারা:৩২০।

তবে মুসলিমদের জন্য নিজের দেশে থেকে ইসলামি ভাবধারায় জীবনযাপনই উত্তম। অন্যান্য রাষ্ট্রে ভ্রমণ বা বসবাসকে স্রেফ প্রয়োজনের স্তরে রাখা যেতে পারে। কেউ কোনো কারণে অন্য দেশে বেশি নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থা লাভ করলে তার জন্য সেখানে বসবাসের সুযোগ রয়েছে। তবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অমুসলিম দেশে বসবাসের শর্ত ২ টি মেনে সেখানে থাকতে হবে। এছাড়াও এই চারটি শর্ত মেনে চলতে হবে:

১. সেখানে বসবাস করতে গিয়ে নিজের ধর্মীয় স্বভাব-চরিত্র বিসর্জন দেওয়া যাবে না। নিজের বা সন্তান-পরিজনের ধর্মকর্মকে কোনো ধরনের শঙ্কার মুখে ফেলা যাবে না। মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। দীনপালন বিঘ্নিত হলে সেখানে বসবাস করা জায়িজ হবে না। গিয়ে থাকলে স্বদেশে ফিরে আসা ওয়াজিব।
২. মুসলিমদের সেখানে ইসলামের সুন্দর জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি হতে হবে, যেন তাঁদের কাজকর্ম ও সততার দ্বারা অমুসলিম প্রতিবেশীরা প্রভাবিত হয়।
৩. দেশান্তরকে মনে মনে পবিত্র হিজরত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে ওই ব্যক্তির প্রবাসজীবন সুন্দর ও পুণ্যময় হবে এবং তাঁর চারপাশের অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশী তাঁর মাধ্যমে কল্যাণসাধন, মহত্ত্ব ও সদাচারে অনুপ্রাণিত হবে।

[10] তথ্যসূত্র: ইমাম ‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, খণ্ড: ৩; পৃষ্ঠা: ২৫-৩০; দারুল ওয়াত্বান, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৩

৪. দেশান্তরিত মুসলিম সর্বদা নিজেকে এবং নিজের পরিবার ও সন্তানদের সব ধরনের মানসিক ও চারিত্রিক রোগ এবং নেতিবাচক পরিবর্তন থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করে নিষ্কলুষ জীবনযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কাফিরদের দেশে বসবাসের বিধানের আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি। আমরা আল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করি, যেন উক্ত সিদ্ধান্ত হক ও সঠিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

যেসব কারণে অমুসলিম দেশে অবস্থান করা যাবে না

প্রথম প্রকার: কোন ব্যক্তি যদি লোক সমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অন্য মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা দারুল কুফরের নাগরিত্ব এবং জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের ন্যাশনালিটি গ্রহণ করে থাকে অথবা তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চাল-চলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের মত হয়ে যাওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে তাহলে এ জাতীয় যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোন দলিল পেশ করা প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় প্রকার: মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করলে অমুসলিম দেশে যাওয়া জায়েজ নয়। প্রয়োজন ছাড়াই কেউ অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ও অন্যান্য সম্পর্ক রাখতে তাদের দেশে চলে গেলে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের হয়ে কোনো কাজে অংশ নিলে তার জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস হারাম ও নাজায়িজ।** এ সম্বন্ধে কুরআনুল কারিমে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

হে ইমানদারগণ, ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের তোমরা বন্ধু বানিয়ো না। তারা নিজেরা একে অন্যের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। (সুরা মায়িদা: ৫১)

তৃতীয় অধ্যায়
অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব অর্জন

এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা হলো, মুসলিম দেশের নাগরিকের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব অর্জন কিংবা তার চেষ্টা বা সেখানকার নাগরিক হয়ে অনৈসলামিক বিধানের অধীনে জীবনযাপনের অবকাশ শরয়িভাবে আছে কি না। বলে রাখা ভালো, এই আলোচনা অমুসলিম দেশে বসবাস ও অবস্থান নিয়ে ইতিপূর্বে কৃত আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি কোনো মুসলিম আগে থেকেই সেখানে থেকে থাকেন, তার ক্ষেত্রে নিচের আলোচনা প্রযোজ্য নয়।

১. নাগরিকত্বের মর্ম

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক বিশেষ রাজনৈতিক এবং আইনি সংযোগের নাম নাগরিকত্ব। এর ভিত্তিতে একের ওপর অন্যের কিছু অধিকার বর্তায়। একে অন্যের কিছু চাহিদা মেটাতে হয় ও কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। এটি এমন এক নীতিগত সম্পর্ক, যার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। যেমন আমেরিকান, হিন্দুস্থানি, বিলেতি, সৌদি ইত্যাদি।

কোনো মুসলিমের জন্য এটা কি ঠিক হবে যে, কোনো মুসলিম রাষ্ট্র থেকে নিজের বাসস্থানের সম্বন্ধকে রহিত করে নিজেকে অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করবে? একজন প্রকৃত মুসলিমের কাছে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কোনো আরব- ভূখণ্ডের অধিবাসীর জন্য এটা কি শোভন যে, সে আমেরিকান বা ব্রিটিশ বলে পরিচিত হবে? কিছুতেই নয়। এমন হলে তো আরব-মুসলিম জাতীয়তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়।

২. নাগরিকত্বের প্রকারভেদ

নাগরিকত্ব দুই প্রকার।

১. জন্মগত নাগরিকত্ব: যেখানে শিশুর মা-বাবা থাকেন। যেটি অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশের নীতি। নবজাত সন্তানের এ নাগরিকত্ব জন্মগতভাবে অর্জিত হয়ে থাকে। এতে সন্তানের কোনো ইচ্ছার দখল নেই।

২. অর্জিত নাগরিকত্ব: দ্বিতীয় প্রকারের নাগরিকত্ব হলো, যা চেষ্টা করে অর্জন করতে হয়। যেমন, ভিনদেশি কোনো নারীকে বিয়ের মাধ্যমে কিংবা সে দেশের প্রশাসন বরাবর আবেদনপূর্বক যা অর্জিত হয়ে থাকে।

আবার কোনো কোনো সময় এমন হয় যে, নতুন দেশের নাগরিকত্ব অর্জিত হওয়ার পর অতীতের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। যেমন, ভারতের কেউ যদি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাহলে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ, এখন সে আর ভারতের নাগরিক নয়, বরং ব্রিটিশ নাগরিক। আবার কোথাও কোথাও এমনও দেখা যায় যে, নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার পরেও আগের রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বহাল থাকে। যেমন, যদি পাকিস্তানের কোনো নাগরিক ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তাহলে তার উভয় দেশের নাগরিকত্বই বহাল থাকে। তার মানে সে একই সময়ে পাকিস্তান ও ব্রিটেনের নাগরিক। পাকিস্তানে থাকবে পাকিস্তানি হয়ে, আর ব্রিটেনে থাকবে ব্রিটিশ হয়ে।

নাগরিকত্ব বিষয়ক আইনকানুনে দেশে দেশে কিছুটা পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে মোটামুটি সব দেশেই যা প্রতিষ্ঠিত আছে তা হলো, কেউ যখন কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে তখন সে এমন সব অধিকার অর্জন করে, যা সেই দেশের একজন ব্যক্তি জন্মসূত্রে লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সে ওই রাষ্ট্রের আইন রচনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারে, সরকারি চাকরি করতে পারে, সেখানে জমিজমা কিনতে পারে এবং এ জাতীয় অন্যান্য সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে। অন্যদিকে সেই রাষ্ট্রও ওই নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির ওপর তার সব সাংবিধানিক নীতি ও অন্যান্য আইনকানুন প্রয়োগ করতে পারে, তার থেকে কর আদায় করতে পারে, শান্তি ও যুদ্ধ সর্বাবস্থায় তার সঙ্গে সে দেশের জন্মগত নাগরিকদের মতো একই রকম আচরণ করতে বাধ্য থাকে এবং কিছুতেই তাকে সেই দেশ থেকে বের করে দিতে পারে না। নাগরিক কর্তব্য ও অধিকারের এসব বিষয় এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে শরয়ী বিধানগুলো বোঝা সহজ হয়।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার বিধান

দু-চারটি দেশ বাদে সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলিমরা তাদের নিজেদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। স্বদেশেই তাঁরা সংখ্যালঘুর মতো জীবনযাপন করছেন। এটা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচন, সম্প্রদায়-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অধিকাংশ জনগণের ভোটে নির্বাচিত দল রাষ্ট্র পরিচালনায় নিযুক্ত হয়। এ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার এবং প্রার্থী বেছে নেওয়ার অর্থাৎ ভোট দেওয়ার অধিকার সবাইকে সমানভাবে দেওয়া হয়। যে এতে পিছিয়ে থাকে, সে অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত

থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইসলামি দর্শন অনুযায়ী পদ ও ক্ষমতা চাওয়া অপছন্দনীয় বিষয়। নবিজি আবদুর রাহমান ইবনু সামুরাকে উদ্দেশ করে বলেছেন:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

আবদুর রাহমান ইবনু সামুরা, পদ চেয়ে নিয়ো না। চেয়ে নিলে তার দায়িত্বভার তোমাকেই বহন করতে হবে, আর চাওয়া ছাড়া পদ পেলে তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে।[11]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন:

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

অচিরেই তোমরা পদপ্রার্থী হতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, অথচ এটা কিয়ামতের দিনে আফসোসের কারণ হবে। পদকে দুধেল জন্তু এবং বড়ই উপভোগ্য বলে মনে হয়, কিন্তু যখন সেটা চলে যায় তখন খুবই খারাপ লাগে।[12]

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন: একদিন আমি ও আমার দুই চাচাত ভাই নবিজির খিদমতে উপস্থিত হলাম। পর্যায়ক্রমে দুজনেই নবিজির কাছে কোনো একটি বিষয়ে পদ চাইলাম। তখন নবিজি বললেন:

إِنَّا وَاللَّهُ لَا نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَو أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ

আল্লাহর কসম, আমরা এ কাজে এমন লোককে দায়িত্বশীল বানাব না, যে এ পদ কামনা করে বা এ পদের প্রতি লোভ পোষণ করে।[13]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন:

---

[11] মুসনাদু আহমাদ: ২০৬৪৭; মুসান্নাফু ইবনু আবি শায়বা: ৩২৫৪৩; সহিহ বুখারি: ৬২৪৮; সহিহ মুসলিম: ১৬৫২।

[12] সহিহ বুখারি: ৭১৪৮; জামিউস সাগির: ৩৭৩২; মিশকাতুল মাসাবিহ ৩৬৮১।

[13] মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা: ৩২৫৪১; সহিহ বুখারি: ৩৩০৫; সহিহ মুসলিম: ১৮৩৩; মুসনাদু আহমাদ: ৭৩০৪।

تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ

তোমরা নেতৃত্ব ও শাসনের ব্যাপারে তাকেই সবচেয়ে উত্তম হিসেবে পাবে, যে এর প্রতি অনাসক্ত, যে পর্যন্ত না তা তার ওপর অর্পণ করা হয়।[14]

সামষ্টিক কল্যাণ সংরক্ষণে এগিয়ে আসা

এটাও বাস্তবতা যে, বৃহত্তর ও জাতীয় স্বার্থরক্ষায় যোগ্য ও ভালো লোককে এ কাজের জন্য এগিয়ে আসতে হয়। তা না করলে অযোগ্য ও মন্দ লোকেরা এ পদ ছিনিয়ে নেবে। ফলে পুরো জাতি সম্মিলিতভাবে এর কুফল ভোগ করবে। এই দুর্দশার দায়ভার কোনো-না-কোনোভাবে এমন লোকেদের ওপর বর্তাবে, যারা উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর একটি বাণী এ ব্যাপারে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আবু সালামা ইবনু আবদুর রাহমান রা. বর্ণনা করেন, আমি কয়েকজন মুহাজির-তনয়কে নিয়ে একবার এক জায়গায় বসে ছিলাম। আমরা ভাবছিলাম আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের জীবনযাত্রার সমস্যা তাঁর কাছে তুলে ধরা। কিন্তু তার আগে আমরা উম্মুল মুমিনিন আয়েশার সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত মনে করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হই। আমরা আমাদের সমস্যার কথা উল্লেখ করলে আয়েশা বললেন, মানুষের কী হলো যে, তারা তাদের বাদশাহ থেকে দূরে থাকে! আমরা বললাম, আমরা তো ভয় করি যে, তারা আমাদেরকে কোনো পদ দিয়ে দেবে। এ কথা শুনে তিনি বলেন :

سُبْحَانَ اللهِ فَإِذَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ خِيَارُكُمْ يُسْتَعْمَلْ شِرَارُكُمْ

সুবহানাল্লাহ, যখন তোমাদের মধ্যকার ভালো লোকেরা কাজে না লাগবে, তখন এসব কাজের দায়িত্ব খারাপ লোকদেরকে দেওয়া হবে।[15]

---

[14] সহিহ বুখারি: ১৪৮৩; সহিহ মুসলিম: ১৮১৮; মুসনাদু আহমাদ: ৯৪১২; সুনানু আবি দাউদ: ৭৩০৪।

[15] আত-তালখিসুল হাবির: ২/৪০২

ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সমতা বিধান

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি ভোট পাওয়া লোকদের নিয়ে, মানে নেতা হওয়ার বিধিবিধান। এখন আলোচ্য
বিষয় হলো জনগণের ভোট দেওয়ার তথা নেতা নির্বাচনের অধিকার ও দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নটাই হলো যোগ্যতার প্রশ্ন। দেখতে হবে, যাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং যাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি বানানো হচ্ছে, তারা আসলেই এ পদের যোগ্য কি না।

এ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতের দোহাই দিয়ে বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচনা করে অযোগ্য বা অসৎ লোকের পক্ষে দাঁড়ানো একটি কঠিন বেইনসাফি এবং অপরাধ। পবিত্র কুরআন বার বার ইনসাফ ও সমতাবিধানের নির্দেশ দিয়েছে এবং একে তাকওয়ার মাপকাঠি হিসেবে ঠিক করেছে। আল্লাহর বাণী :

اِعۡدِلُوۡا هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰی وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ٨

সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [সুরা মায়িদা : ৮]

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহ. উমর রা.-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন :

যে ব্যক্তি এমন লোককে কোনো দলের প্রতিনিধি বানাল যার চেয়ে উত্তম লোক সেই দলে রয়েছে, সে আল্লাহ, রাসুল ও মুমিনদের সঙ্গে খিয়ানত করল। তাই উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে উত্তম লোককে নির্বাচিত করা ওয়াজিব।[16]
ভোট দেওয়ার ব্যাপারে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে লক্ষ রাখা উচিত। মুফতি শফি রাহ. ভোটকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন:

১. প্রথমত, এটা সাক্ষ্য। ভোট প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (প্রার্থী) যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, সততা ও একনিষ্ঠতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে হিসেবে তার ওপর সাক্ষ্যের বিধান কার্যকর হবে। আর

[16] ওয়াজিফাতুল হুকুমাতিল ইসলামিয়া, ইবনু তাইমিয়া : ১২।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া গুরুতর অপরাধ, একে শিরকের সঙ্গে কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[17]

২. ভোট একটি সুপারিশ বা অনুরোধ। কোনো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার মানে হলো তাকে পদটি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন যে নীতিমালা প্রদান করেছে, তা অনুসরণ করতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ لِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا)

'কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আল্লাহ সব বিষয়ে নজর রাখেন।' [সুরা নিসা: ৮৫]

ভালো সুপারিশ মানে হলো যোগ্য ও দীনদার লোকের পক্ষে কথা বলা, যে আল্লাহর সৃষ্টির হক পূর্ণরূপে আদায় করবে। আর মন্দ সুপারিশ হলো অযোগ্য, পাপাচারী ও অত্যাচারী লোকের পক্ষে কথা বলে সমাজ ও মানুষের ওপর তাকে চাপিয়ে দেওয়া। এই হিসেবে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থী তার মেয়াদে যা পাপ-পুণ্য করবে, ভোটার তার ভালো ও মন্দ কাজের শরিক হিসেবে গণ্য হবে।

৩. ভোটের তৃতীয় অর্থ হলো উকিল বানানো। ভোটার প্রার্থীকে রাষ্ট্র ও জাতির অধিকারসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে নিজের প্রতিনিধি বা উকিল সাব্যস্ত করছে। উকালতির নীতিমালা অনুযায়ী ভালো-মন্দ সবকিছু মক্কেল অর্থাৎ ভোটারের ওপর বর্তাবে।[18]

৪. মুফতি আখতার ইমাম আদিল কাসিমির মতে, আরেকটি দিক হলো মতামত ও পরামর্শ। যেভাবে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে কোনো কাজ করার অনুমোদন দেওয়া হয়ে থাকে। নির্বাচন কমিশনারদের রাষ্ট্রপ্রধান ও তার কাজের সহযোগীদের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বৈধতা দানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। জনগণকে মাঠে থাকা বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, যিনি রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনের বেশি যোগ্যতা

---

[17] মুত্তাফাক আলাইহি, নাইলুল আওতার: ৮/৫৬৫।

[18] জাওয়াহিবুল ফিকহ : ২/২৯১-২৯৩।

রাখেন। ভোটার ব্যালট পেপার ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশনকে গোপনে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। এভাবেই পরামর্শ ও মতামত দেওয়ার কাজটি ঘটে।

হাদিসে এই পরামর্শ ও মতামতকে আমানত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন:

المستشار مؤتمن

পরামর্শদাতা আমানতদার হয়ে থাকে। [19]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, নবিজি বলেন:

المَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

আসরগুলো আমানতস্বরূপ।[20]

আমানতের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ

নিশ্চয়ই প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন। [সুরা নিসা : ৫৮]

ভোটের মাধ্যমে ভোটারকে তার আমানতদারির প্রমাণ দিতে হয়। তাই যার ব্যাপারে সে মতামত জানাচ্ছে তার কাছে সেই ব্যক্তিকে যোগ্য বলে মনে হতে হবে। কাকে সে নিজের আমানত প্রদান করছে তা অন্যকে জানাবে না। কারণ এতে আমানতের খিয়ানত হওয়ার বা ফিতনার আশঙ্কা থাকে।

---

[19] সুনানু আবি দাউদ: ৫১২৭; সুনানুত তিরমিজি: ২৮২২; সুনানু বায়হাকি: ২০১০৯, ৩৭৪৫।

[20] সুনানু আবি দাউদ: ৪৮৬৯; সুনানু বায়হাকি : ২০৯৫১।

ভোট দেওয়ার বিধান

ভোট দেওয়ার মাধ্যমে এ চারটি পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়। সাক্ষ্য হিসেবে ভোট দেওয়া ওয়াজিব। পবিত্র কুরআন সাক্ষ্য দেওয়াকে আবশ্যক করে দিয়েছে। বলা হয়েছে :

يٰـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰامِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ

হে ইমানদাররা, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সঙ্গত সাক্ষ্য দাও। [সুরা মায়িদা: ৮]

يٰـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰامِيۡنَ بِالۡقِسۡطِ

হে মুমিনরা, তোমরা সঙ্গত সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকবে। [সুরা নিসা: ১৩৫]

وَاَقِيۡمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ

তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও। [সুরা তালাক : ২]

কোনো প্রার্থীর যোগ্যতা ও সততা সম্পর্কে ভোটারের জানা থাকলে এবং তার কাছে সেই প্রার্থীকে তুলনামূলক বেশি যোগ্য মনে হলে, শরিয়তের নির্দেশ হলো সে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকবে না। কুরআনের সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধান এটাই বলে। এ ক্ষেত্রে ভোট না দিলে সে গুনাহগার হবে। কোনোদিকে মন সায় না দিলে, কে বেশি উপযুক্ত প্রার্থী তা বুঝতে না পারলে, আরও ভাবতে হবে। সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। ফলাফল এবং ভোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত জাতীয় ও সামাজিক উপকারিতা বিবেচনায় বিধান হলো, ভোটারের জন্য ভোট দেওয়া ওয়াজিব।

প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড

দলীয় ও স্বতন্ত্র, নির্বাচনে প্রার্থীরা এ দুই ধরনের হয়ে থাকে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত জীবন, স্বভাব, মুসলিমদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি দেখে ফায়সালা করতে হবে। সব দিক দিয়ে যে প্রার্থীকে ভালো মনে হবে তাকে ভোট দিতে হবে।

কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর ক্ষেত্রে দেখতে হবে সেই দলের নীতি, নির্বাচনী ইশতেহার এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ, সেখানে ব্যক্তির জয়কে ধরা হবে তার দলের জয় হিসেবে। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত করতে ব্যক্তির চাহিদার চেয়ে দলের চাহিদা ও নীতিমালাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তখন কোনো সদস্যের একক কর্তৃত্ব খাটে না, সে হয় কেবল সম্মিলিত সিদ্ধান্তের অংশী মাত্র। সদস্যপদ টিকিয়ে রাখতে সে দলীয় নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে পারে না। তাই মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া যাবে না, ব্যক্তিগতভাবে সে সজ্জন বা মুসলিম হলেও। কোনো মুসলিমের এমন দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বৈধ নয়। বরং যে দলটি মুসলিমদের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচারের মানসিকতা দেখাতে পারে, সেই দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। ভালো স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীকেও ভোট দেওয়া যেতে পারে, সে অমুসলিম হলেও।

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটের বিধান

নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানা স্বার্থের টানে একে অন্যের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে শুরু করে। এভাবে মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলো কোনো অমুসলিম দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে চাইলে এর অনুমতি রয়েছে, সেই অমুসলিম দলটি কট্টরপন্থী সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির হলেও। তবে শর্ত হলো, মুসলিম দল বা প্রার্থীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় মর্যাদা কালিমালিপ্ত হতে দেওয়া যাবে না। চুক্তিবদ্ধ দলকে নিজের নির্বাচনী প্রচারণা থেকে এমন কঠোরতা ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে সম্মত থাকতে হবে, যা মুসলিমদের কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। এ ছাড়া সম্মিলিতভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এভাবে কোনো সাম্যবাদী রাজনৈতিক দল কোনো কট্টরপন্থী অমুসলিম দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলে এবং কট্টরপন্থী দলের ইশতেহারে তারা নিজেদের নেতিবাচক মানসিকতা বর্জন করার ঘোষণা দিলে জোটবদ্ধ হওয়া যাবে। এ নিয়মে নির্বাচন করারও অনুমতি দেওয়া যাবে। এ ব্যাপারেও শর্ত হলো, এর বিপরীতে কোনো উপযুক্ত মুসলিম দল বা সাম্যবাদী দল না থাকার অবস্থা।অন্যথায় জোটের মাধ্যমে কট্টরপন্থী দলকে কোনো সহায়তা করা যাবে না। এর ভিত্তি
পবিত্র কুরআনের এ আয়াত :

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

বলো, হে আহলে কিতাবগণ, একটি বিষয়ের দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের জন্য সমান। [সুরা আলে ইমরান: ৬৪]

এ আয়াতে ইয়াহুদিদের সম্মিলিত একটি স্বার্থের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করা হয়েছে। মুসলিমদের জন্য ইয়াহুদিদের চেয়ে বড় শত্রু সেই যুগে ছিল না, এখনো নেই। কুরআনেও এসেছে তাদের শত্রুতা ও কঠোরতার কথা। তারা সবসময় সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় মত্ত। আল্লাহর বাণী :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

তুমি মুসলিমদের বড় শত্রু হিসেবে ইয়াহুদি ও মুশরিকদেরই পাবে। [সুরা মায়িদা: ৮২]

তবু সম্মিলিত স্বার্থের ভিত্তিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করা হয়েছে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, মুসলিমদের ধর্মীয় কল্যাণ সংরক্ষণ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ওপর অটল থেকে যদি চুক্তি করার প্রয়োজন পড়ে, তবে সেই সুযোগ রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অমুসলিম দেশে বসবাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

অমুসলিম দেশে বসবাসের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়, যা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব ফেলে। এসব প্রতিবন্ধকতা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের ইবাদত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব, সামাজিক বৈষম্য, সংস্কৃতির ভিন্নতা, এবং আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে সৃষ্টি হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো মুসলিমদের ধর্মীয় প্রার্থনা ও আচার-অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

মুসলিমদের ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধার একটি হল নামাজ আদায়ে সমস্যা। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামাজ দ্বিতীয় স্তম্ভ। নামাজ একটি ফরজ ইবাদাত। নামাজ পরিত্যাগ করা কুফরি। অথচ অমুসলিম দেশে মসজিদের সংখ্যা কম হওয়ায় নামাজের জন্য সহজলভ্য জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন। অনেক দূরে দূরে মসজিদ থাকায় মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দেশে মসজিদে উচ্চস্বরে আযান দেয়া নিষিদ্ধ। জুমার নামাজ পড়া যায় না। অনেক কর্মস্থলে নামাজের সময় ও জায়গা দেওয়া হয় না। নামাজ আদায়ের জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়।

অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।-সূরা বাকারা (২) : ৪৩

অন্যত্র বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।-সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

আর বেনামাজির অবস্থান হবে সাকার নামক জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতিটি কাজের হিসাব নেবেন। আর প্রতি কাজের হিসাব দিতে না পারলে শাস্তি অবধারিত। শাস্তি প্রাপ্ত মানুষকে তাদের অপরাধে কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তাদের অপরাধগুলোও বলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে সে কথা তুলে ধরেন এভাবে-

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣

‘কোন জিনিস (কাজ) তোমাদেরকে (সাকার) জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা বলবে আমরা নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।”— সুরা আল-মুদ্দাচ্ছির : আয়াত ৪২-৪৩

নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তিকে কবরের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। যেমন সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে: “তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমাত।

নামাজ না পড়লে শুধু পরকালেই নয়, দুনিয়ার জীবনেও নেমে আসে অশান্তি, হতাশা, অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট। দুনিয়ার জীবনে বেনামাজির জন্য ৫টি শাস্তির কথা জানা যায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে।

১. আল্লাহতায়ালা নামাজ ত্যাগকারীকে দুনিয়ার জীবনে সব কাজের বরকত থেকে মাহরূম/বঞ্চিত করেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাজা হয় তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। (মুসলিম, হাদিস : ১৩০৪)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেন, 'নামাজ হলো ঈমানদার ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। আবার যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিল তবে সে কুফরি করল'। (তিরমিজি : ২৬২০, আবু দাউদ: ৪৬৭৮)

২. নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তির চেহারায় কোনো নূর বা উজ্জ্বলতা থাকে না।

৩. যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করে, ওই ব্যক্তি দুনিয়ার অন্যান্য ভালো কাজের কোনো পুরস্কারও পাবে না।

৪. নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তির জন্য কোনো লোক দোয়া করলে, তা কাজে আসবে না।

৫. নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহতায়ালা সব সৃষ্টিজীবের কাছে ঘৃণিত। কোনো সৃষ্টিজীবই তাকে পছন্দ করবে না।

৬. ইসলামের শান্তি ও প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হবে। (শারহুল আকিদাতুত তাহাবি : ২৬৮)

পাঁচটি স্তম্বের মধ্যে রোজা তৃতীয়। এটি একটি অন্যতম ফরজ ইবাদত। কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রমজানের সময় মুসলিমদের জন্য কাজের সময় বা ক্লাসের সময়সূচি সমন্বয় করে না। অনেক সময় অমুসলিম সহকর্মী বা বন্ধুরা রোজার গুরুত্ব না বুঝে বিরূপ মন্তব্য করতে পারে।

অনেক অমুসলিম দেশে ঈদ উপলক্ষে ছুটি দেওয়া হয় না, যা মুসলিমদের জন্য পরিবার ও সম্প্রদায়ের সাথে ঈদ উদযাপন কঠিন করে তোলে। ইসলামী উৎসব উদযাপনের জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের অভাব দেখা যায়।

মসজিদে যাওয়া বা প্রকাশ্যে নামাজ পড়ার জন্য অপমান বা হুমকির শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইসলামী অনুষ্ঠানে (যেমন দাওয়াহ বা মজলিস) অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও পরিবেশ পাওয়া কঠিন।

পর্দার ক্ষেত্রে

অমুসলিম দেশে মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য পর্দা পালনের সমস্যা বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনি কারণে জটিল হয়ে থাকে। এসব সমস্যা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইসলামিক মূল্যবোধ রক্ষায় বাধা সৃষ্টি করে। অনেক অমুসলিম সমাজে হিজাব বা নিকাব পরা মুসলিম নারীদের ধর্মীয় অনুশীলনকে অবমাননা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। পর্দা পালনকারী মুসলিম নারীরা সমাজে কটূ মন্তব্য, হাসি-তামাশা, বা অপমানের শিকার হয়ে থাকেন। অমুসলিম সংস্কৃতিতে খোলামেলা পোশাককে স্বাভাবিক ধরা হয়। তাই পর্দা পালনকারী নারীদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় ।

অনেক কর্মস্থলে হিজাব বা নিকাব পরা নিরুৎসাহিত করা হয় বা তা নিষিদ্ধ থাকে। ইসলামী পোশাকের কারণে নারীদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা সীমিত হয়ে থাকে। নারীরা বৈষম্যের শিকার হন এবং অনেক ক্ষেত্রে চাকরি পেতে অসুবিধা হয়।

ফ্রান্সসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে বোরকা পরার বিরুদ্ধে আইন করা হয়েছে। কিছু অমুসলিম দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব বা নিকাব নিষিদ্ধ। স্কুল বা কলেজে হিজাব পরা নারীরা সহপাঠীদের অবজ্ঞা বা চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তখন সন্তানদের জন্য ইসলামিক পোশাক বা হিজাব বজায় রাখা অভিভাবকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি কিছু দেশে হিজাব বা নিকাব পরিধানে সরাসরি আইনি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সের মতো কিছু দেশে প্রকাশ্যে হিজাব বা নিকাব পরা নিষিদ্ধ। এতে করে পর্দা পালনকারী নারীরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় ভুগেন।

অনেক দেশে পরিচয়পত্রের জন্য নিকাব খুলে ছবি তোলার প্রয়োজন হয়, যা ধর্মীয় অনুভূতির বিরোধিতা করে। ইসলামফোবিয়ার কারণে পর্দা পরিধানকারী নারীদের উপর শারীরিক বা মানসিক নিপীড়ন হয়ে থাকে।

হিজাব বা নিকাব পরিধানের কারণে মুসলিম নারীদের বিভিন্ন সেবা (যেমন: পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, রেস্টুরেন্ট, বা চিকিৎসা) থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে।

এক বিবৃতিতে ইসলামী মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি বলেছেন, ২০০৪ সালে ফ্রান্সের স্কুলগুলোতে উড়না বা স্কার্ফ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে দেশটিতে অনেক মুসলিম মেয়ে পড়াশোনা ও চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। দেশটিতে মুসলমানদের ওপর হামলা বাড়তে থাকায় তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীতা বাড়ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মুসলিম পরিবারগুলো নিজের সন্তানদের জন্য পর্দা বজায় রাখতে চাইলেও অমুসলিম সমাজের পরিবেশে তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেক অভিভাবক মনে করেন, হিজাব বা নিকাবের কারণে তাদের সন্তান সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছে না। কিছু অমুসলিম দেশে হিজাব বা নিকাব পরা নারীরা হয়রানি বা আক্রমণের শিকার হতে পারেন, যা তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

অনেকে মনে করেন, পর্দা-বিধান শুধু নারীর জন্য। এ ধারণা ঠিক নয়। পুরুষের জন্যও পর্দা অপরিহার্য। তবে উভয়ের পর্দার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যে শ্রেণীর জন্য যে পর্দা উপযোগী তাকে সেভাবে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরআনে পুরুষদের তাদের দৃষ্টির হেফাজত করতে বলা হয়েছে। এই অমুসলিম দেশগুলোতে নারীদের ফিতনায় পুরুষদের প্রতিনিয়ত পরতে হচ্ছে।
প্রথমে পোশাক ছিল হাটুর নীচ পর্যন্ত, এরপর তা উঠে এল হাটুর উপরে। এরপর এল প্যান্ট-ফতুয়া, এল নেটের জামা, এল টাইটস-সর্টস। যেন হাদীসে বর্ণিত ‘পোশাক পরিহিতা নগ্ন নারী’র দৃষ্টান্ত একের পর প্রকাশিত হতে লাগল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা বেহেশতের ঘ্রাণটুকুও পাবে না।

অথচ পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কুরআন মজীদের কয়েকটি সূরায় পর্দা-সংক্রান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে। পর্দার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সকল শ্রেণীর ঈমানদার নারী-পুরুষকে সম্বোধন করেছেন। এটি শরীয়তের একটি ফরয ও অকাট্য বিধান। এ বিধানের প্রতি সমর্পিত থাকা ঈমানের দাবি। কুরআন মজীদের অনেকগুলো আয়াতে এই বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো ঈমানদারের পক্ষে এই বিধানকে হালকা মনে করার সুযোগ নেই।
কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদেরকে আদেশ করেছেন যখন তারা কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন যেন মাথার উপর থেকে ওড়না/চাদর টেনে স্বীয় মুখমন্ডল আবৃত করে। আর (চলাফেরার সুবিধার্থে) শুধু এক চোখ খোলা রাখে।-ফাতহুল বারী ৮/৫৪, ৭৬, ১১৪

অনেকে মনে করেন, পর্দা-বিধান শুধু নারীর জন্য। এ ধারণা ঠিক নয়। পুরুষের জন্যও পর্দা অপরিহার্য। তবে উভয়ের পর্দার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যে শ্রেণীর জন্য যে পর্দা উপযোগী তাকে সেভাবে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরআনে প্রথম পুরুষের পর্দার কথা বলা হয়েছে। সূরা নুরের ৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰي لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

'মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নিচু করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে বিষয়ে জানেন।'

অথচ এই অমুসলিম দেশগুলোতে নারীদের ফিতনায় পুরুষদের প্রতিনিয়ত পরতে হচ্ছে। প্রথমে পোশাক ছিল হাটুর নীচ পর্যন্ত, এরপর তা উঠে এল হাটুর উপরে। এরপর এল প্যান্ট-ফতুয়া, এল নেটের জামা, এল টাইটস-সর্টস। যেন হাদীসে বর্ণিত 'পোশাক পরিহিতা নগ্ন নারী'র দৃষ্টান্ত একের পর প্রকাশিত হচ্ছে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা বেহেশতের ঘ্রাণটুকুও পাবে না।

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে

অমুসলিম দেশের পাঠ্যক্রমে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি থাকে না। সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামের বিরোধী বিষয় বা মতবাদও পড়ানো হয়। উদাহরণ: বিবর্তন তত্ত্ব। যে কারণে বাচ্চাদের মধ্যে থেকে ইসলামী ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী কালচারগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের ফরজ বিধানগুলো সম্পর্কেও জানা এবং মানার প্রবণতা থাকে না যা কিনা একজন মুসলিম শিশু এবং তার পরিবারের জন্য হুমকি স্বরূপ।

বরং ওই সব দেশে অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে বাচ্চাদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করানো হয়। যেমনঃ বড়দিন, স্টার সানডে ইত্যাদি। স্কুলের বন্ধুরা সন্তানদের ইসলামের বাইরে অন্য জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট করে। এতে করে বাচ্চাদের মধ্যে ইসলামী রীতি-নীতির পরিবর্তে অমুসলিমদের রীতি-নীতির চর্চা বেশি দেখা যায়।

অমুসলিম দেশে ইসলামী স্কুল বা মাদরাসার অভাব থাকায় সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানরা এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠে যেখানে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি খুব কম আলোচিত হয়। কুরআন ও ইসলামিক শিক্ষা প্রদানের জন্য যথাযথ শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান সহজলভ্য হয় না এবং খুব ব্যয়বহুল হয়।

সন্তানরা অমুসলিম সংস্কৃতির সাথে মিশে এমন আচরণ বা অভ্যাস গ্রহণ করে, যা ইসলামী নীতি বা শৃঙ্খলার পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ অবাধ মেলামেশা, পোশাক এবং চালচলনের ক্ষেত্রে অমুসলিম মানসিকতার প্রভাব। টেলিভিশন, ইন্টারনেট, এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অপসংস্কৃতি ও অনৈতিক বিষয় সন্তানদের মানসিকতায় প্রভাব ফেলছে। বাচ্চাদের প্রয়োজনমতো শাসন করা যায় না। বাচ্চা স্কুলে অভিযোগ করলেই চাইল্ড এভিউজ এর নামে বাবা-মাকে হেনস্থা করা হয়। মেয়ে সন্তানদের জন্য হিজাব পরিধান করা বা ইসলামী পোশাক পরার ক্ষেত্রে কটূক্তি বা অবজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়। এতে করে তাদের মধ্য থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিচ্যুতি ঘটছে।

মুসলিম বাচ্চারা ঈদ, রমজান বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করার পরিবেশ পায়না। তাদের ধর্মীয় পোশাক, আচরণ বা নামের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়। স্কুল বা সমাজে ইসলামের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে। মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টার দূরে থাকায় সন্তানদের ইসলামিক শিক্ষা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কমে যায়। হালাল খাদ্যের অনিশ্চয়তার কারণে অভিভাবকদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সন্তানের উপর নিয়ম আরোপ করতে হয়। সন্তানদের জন্য মুসলিম বন্ধু তৈরি করা এবং ইসলামিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা কঠিন হয়ে যায়।

অভিভাবকরা সন্তানদের ইসলামী মূল্যবোধ শেখানোর চেষ্টা করলেও অমুসলিম পরিবেশে তা বজায় রাখা কঠিন।
কারণ শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। তারা তাদের চারপাশে যা দেখে তাই শিখে। অতএব অমুসলিম পরিবেশে একজন শিশুকে মুসলিম হিসেবে তৈরি করা খুবই কঠিন। একসময় তারা ইসলামের বিধি-নিষেধকে কঠোর বলে মনে করে। যার ফলে তার দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অথচ সন্তান আমানত স্বরূপ। তাকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া বাবা মায়ের কর্তব্য। শেষ বিচারের দিন এ সম্পর্কে বাবা-মাকে জবাবদিহি করা হবে। মানুষের মৃত্যুর পর তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়,

চলতে থাকে শুধু সাদকায়ে জারিয়া। সন্তান এই সাদকায়ে জারিয়ার অন্যতম মাধ্যম। অথচ তাকে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা না দেয়ার কারণে এই সাদকায়ে জারিয়া, গুনাহে জারিয়া হয়ে যেতে পারে।

খাদ্যের ক্ষেত্রে

অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলিমদের জন্য হালাল খাদ্য নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। হালাল খাদ্যের প্রাপ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত থাকে, যা মুসলিমদের খাদ্যাভ্যাস ও ধর্মীয় নির্দেশনা মেনে চলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

অধিকাংশ অমুসলিম দেশে হালাল উপায়ে জবাই করা মাংস সহজলভ্য নয়।
হালাল পশু-পাখি খাওয়া ‘হালাল’ হবার জন্য প্রধান শর্ত হল, সেটিকে আল্লাহর নামেই জবাই করতে হবে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। (সুরা আনআম-১২১)
শরীয়ত সম্মত জবেহ’র আরেকটি শর্ত হলো জবেহকারী মুসলমান বা আহলে কিতাব হওয়া, চাই সে জিম্মি হোক বা হারবি।
আল্লামা তুমারতাশী রাহ. বলেন-

وشرط كون الذابح مسلما أو .... كتابيا ذميا، وحربيا، فتحل ذبيحتهما، ولو الذابح ... ياصب يعقل التسمية والذبح.

জবেহকারী মুসলমান বা আহলে কিতাব হওয়া শর্ত, সে জিম্মী হোক কিংবা হারবী। তাদের জবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে। যদিও জবেহকারী হয় বুঝমান বাচ্চা, যে বিসমিল্লাহ পড়া এবং জবেহ করা বোঝে।" (আদ্দুররুল মুখতার: ৯/৪২৭, (তানবীরুল আবসারের ইবারাত) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ)

কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জাজিরাসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে মুরগি জবেহ থেকে শুরু করে প্যাকেট জাত করা পর্যন্ত সব কাজই অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়।

মেশিনের একদিকে জীবিত মুরগি দিলে অপরদিকে প্যাকেট হয়ে বেরিয়ে আসে। মুরগি জবেহ, দেহ থেকে চামড়া অপসারণ, পেটের ভেতর থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করা, গোশত পরিষ্কার হয়ে প্যাকেট হওয়া ইত্যাদি সবগুলো পর্যায়ই একটি বৈদ্যুতিক। অটো মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগি জবাইয়ে কিছু ভুল আছে। এগুলো হলো:

১.এসব মেশিনে সংযোজিত ছুরিগুলো মুরগির গলার রগগুলো কাটার জন্য যথেষ্ট হলেও কোনো কোনো সময় যে কোনো কারণে। হুকে টানানো মুরগিগুলোর গলা অকর্তিত থেকে যায়। কিংবা অল্প কেটে বেশি অংশ অকর্তিত থেকে যায়। আর এই দুই অবস্থায়। শরী'আত সম্মত জবেহ হয় না।

২.মেশিনে ছুরিগুলো সংযোজিত থাকলে প্রতিটি মুরগির জন্যে বিসমিল্লাহ পড়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ জবেহকারী নির্ধারণ করা আবশ্যক। যেহেতু বিসমিল্লাহ পড়া জবেহকারীর উপর ওয়াজিব। সুতরাং যদি জবেহকারী ব্যতীত অন্য কেউ বিসমিল্লাহ পড়ে এবং জবেহকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে ঐ পশু খাওয়া হালাল হবে না। যদি মেনেও নেয়া হয়, যে ব্যক্তি মেশিন চালু করে সেই জবেহকারী। তবুও প্রতিটি মুরগী হালাল না হওয়ার আশংকা বিদ্যমান, যেহেতু তার পক্ষে প্রতিটি মুরগির জন্যে বিসমিল্লাহ পড়া সম্ভব নয়। কেননা যে ব্যক্তি সকালে মেশিন চালু করলো, সে তো একবার চালু করার। পর মেশিনটি দিনব্যাপী সর্বক্ষণ চলতেই থাকে। আবার অনেক সময় তো রাতদিন লাগাতার মেশিন চালু থাকে। আর হাজার। হাজার মুরগির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এছাড়াও ছুরির সামনে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তির বিসমিল্লাহ পড়া শরী'আতের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়।

৩.মেশিনে জবেহ করলে মুরগির মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, এটি মাকরূহ। আল্লামা আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন- ومن بلغ بالسكين أو عا النخ قطع الرأس، له كره ذلك، كلووت ذبيحته. জবেহে গর্দানের শেষ হাড্ডি পর্যন্ত কাটা বা মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা মাকরূহ। তবে তার গোশত খাওয়া যাবে।” (হেদায়া: ৪/৪৩৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

৪.গরম পানির ভেতর মুরগির অতিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যেসব মুরগির গলা ঘূর্ণায়মান ছুরির দ্বারা। একেবারেই কাটে নি, বা অল্প কেটেছে এবং তার ভেতর প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে, গরম পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার। কারণে সেগুলোর মৃত্যু ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

৫.মুরগিগুলো নাড়িভুঁড়ি বের করার পূর্বেই গরম পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে থাকে। যদি পানি উত্তপ্ত গরম হয় এবং এতটুকু সময় পানিতে থাকে যে, নাপাকি গোশতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

উল্লিখিত সমস্যাগুলোর আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহ করা জায়েয নেই।কেননা আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহ করলে তা হারাম হওয়ার সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। আর রাসূলুল্লাহ সাঃ একাধিক হাদীসে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বা স্ন্যাকসে হারাম উপাদান (যেমন: শুকরের চর্বি, জেলাটিন, অ্যালকোহল) থাকতে পারে।
অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যপণ্যে হালাল সার্টিফিকেট না থাকায় তা খাওয়ার উপযোগিতা নিশ্চিত করা কঠিন।

সাধারণত অমুসলিম দেশে হালাল রেস্টুরেন্টের সংখ্যা কম। আর আর থাকলেও রেস্টুরেন্ট গুলো খুব ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। এমনকি হালাল রেস্টুরেন্টেও কিছু ক্ষেত্রে রান্নার সময় হারাম উপকরণের সংস্পর্শ হতে পারে। আবার অনেক রেস্টুরেন্টে হালাল এবং হারাম খাদ্য একসঙ্গে পরিবেশন করা হয়, যা মুসলিমদের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

অমুসলিম দেশগুলোর অনেক নাগরিক হালাল এবং হারামের পার্থক্য সম্পর্কে জানেন না। হালাল খাদ্যের গুরুত্বকে অনেক সময় অবজ্ঞা করা হয়। অমুসলিম বন্ধু বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে খাওয়ার সময় খাবারের হালাল হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনেক সময় সামাজিক অস্বস্তির কারণ হয়। হালাল খাদ্যের উপর জোর দেওয়ার কারণে অনেক সময় মুসলিমরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের মালিকানাধীন দোকানের সংখ্যা সীমিত, যেখানে হালাল পণ্য সহজলভ্য। প্রতিটি পণ্যের উপাদান পরীক্ষা করা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। হালাল পণ্য দূরবর্তী স্থান থেকে আমদানি করতে হয়, যা খরচ বাড়িয়ে দেয়। ফলে হালাল খাদ্যের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি হয়, যা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মুসলিম পরিবারগুলোর জন্য আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। অমুসলিম দেশের স্কুলগুলোর খাবারের তালিকায় সাধারণত হালাল খাবার থাকে না। কর্মস্থলে খাবারের সময় হালাল খাবার পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

অথচ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা হালাল খাবার প্রহরের নির্দেশ দিয়েছেন। সুরা মায়িদার ৮৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন, তা থেকে হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু খাও এবং যেই আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান রাখ তাকে ভয় করে চলো।"
আর ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল খাবার। বিশ্বাসী মানুষের ইমানি দায়িত্ব হালাল খাবার গ্রহণ করা ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

নৈতিক অবক্ষয়

অমুসলিম দেশগুলিতে মদ্যপান এবং মাদক ব্যবহার সামাজিকভাবে স্বাভাবিক বলে বিবেচিত, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।মুসলিমরা এই পরিবেশে বসবাস করলে কখনও কখনও বন্ধু বা সহকর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসব কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

বয়স ১৮ হলেই ছেলে-মেয়ে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। স্কুল-কলেজে এমন শিক্ষাদান করা হয়, যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর হতে পারে। স্কুলে থাকতেই বাচ্চাদের সেক্স এডুকেশন দেয়া হয় যা ধর্মীয় শিক্ষা এবং শালীনতার পরিপন্থী। বিয়ের মত একটি পবিত্র বন্ধনকে ওইসব দেশে কোন গুরুত্বই দেয়া হয় না।
ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার কারণে ঐ সকল দেশে বর্তমানে গর্ভপাতের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। লিভ টুগেদার এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেখানে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান জন্ম এবং বিচ্ছেদের হার মুসলিম সংস্কৃতির তুলনায় অনেক বেশি।

অনেক অমুসলিম দেশে সমকামিতা বা এলজিবিটি সংস্কৃতি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, যা ইসলামের নৈতিকতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে সমকামীতার ব্যাপক প্রসারের কারণে স্কুল কলেজে এগুলোর প্রভাব পড়ছে। বাচ্চাদের স্কুলে থাকতেই সমকামিতার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তাদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তুমি চাইলেই একজন মেয়ে হতে পারো, চাইলেই একজন ছেলে হতে পারো। যা ধর্মীয় শিক্ষার বিপরীত।
সমকামিতার অপরাধে আল্লাহ তাআলা কওমে লুত তথা লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন আমার আদেশ এসে পৌঁছাল, তখন

আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথর-কঙ্কর।' (সুরা হুদ: ৮২)

নারীদের মডেল হিসেবে ব্যবহার এবং তাদেরকে বিনোদনের একটি অংশ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। নারীরা অনেক সময় যৌন হয়রানি এবং অশালীন আচরণের শিকার হন। যৌনকর্মীদের অবাধ বিচরণে ঐ সকল দেশে খুব সহজেই ইসলামী মূল্যবোধ থেকে পদস্খলিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

যা থেকে বোঝা যায় ঐ সকল দেশের পরিবেশ খুব সহজেই হারামের দিকে ধাবিত করে। ফলে মুসলিমদের জন্য নৈতিক অবক্ষয় এবং শালীনতার অভাব একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম ও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক

যেসব এলাকায় মুসলিম-অমুসলিমের পাশাপাশি বসবাস সেখানে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়, মাসআলা সৃষ্টি হয়। এ অধ্যায়ে এটাই আলোচ্য।

সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ইসলামবিরোধী

প্রথম সমস্যা হলো, প্রতিবেশী হওয়াটা পরস্পরের সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। অমুসলিমদের পথ ও প্রথা থেকে মুসলিমদের যথাসাধ্য দূরে থাকতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন ও অনুকরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইবাদত ও চালচলনের সব ক্ষেত্রে এমন পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোনো ধরনের অনৈসলামিক প্রভাব নেই। বহু হাদিসে ইসলামি জীবনধারাকে অনৈসলামিক সংস্কৃতি থেকে পবিত্র রাখার নির্দেশনা এসেছে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেছেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে কোনো জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[21]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেছেন:

إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا

রুকানা রা. বলেন, রাসুল () বলেছেন:

এটা কাফিরদের কাপড়, পরতে যেয়ো না।[22]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেছেন :

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

---

[21] সুনানু আবি দাউদ: ৪০৩১/১১৯৯; মুসান্নাফু ইবনু আবি শাইবা: ১৯৪০।

[22] মুসনাদু আহমাদ: ৬৯৩১; সহিহ মুসলিম: ২০৭৭; নাইলুল আওতার: ৫৩১৬; হাকিম: ৭৩৯৮।

ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানরা চুলে খেজাব ব্যবহার করে না, তোমরা তাদের উলটোটা করো।[23]

আবু হুরায়রা রা. থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসুল ﷺ বলেছেন:

غَيِّرُوا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهوا باليهود

সাদাকে খেজাব দ্বারা পরিবর্তন করো। ইয়াহুদিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।[24]

রাসুল ﷺ উম্মতের সাংস্কৃতিক মিশ্রণের আশঙ্কা করে বলেছেন :

তোমরা তোমাদের পূর্বসূরিদের অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে ঢোকে, তোমরাও তা-ই করবে। সাহাবিরা বললেন, আল্লাহর রাসুল, পূর্বসূরি বলতে কি ইয়াহুদি-নাসারা? তিনি বললেন, তাহলে আর কে![25]

হাদিসের গ্রন্থে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোতে অমুসলিমদের সভ্যতা- সংস্কৃতির সঙ্গে মিশতে মুসলিমদের নিষেধ করা হয়েছে। কোনটার বিধান কী, সেদিকে না তাকিয়েই এক বাক্যে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিমদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে পবিত্র রাখাই এসব হাদিসের মৌলিক উদ্দেশ্য।

এ ধরনের বর্ণনা নিয়ে গবেষণা করলে বোঝা যায়, ইসলাম চায় মুসলিমরা পৃথিবীর যে অংশে থাকবেন সেখানে স্বকীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-মর্যাদাবোধ নিয়েই থাকবেন। এ কারণে আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহুদি-নাসারা সরানোর কাজ নবির যুগেই শুরু হয়েছিল, আর এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছিল উমর রা.-এর সময়ে। রাসুল ইয়াহুদিদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন :

হে ইয়াহুদি সম্প্রদায়, মুসলিম হয়ে যাও, নিরাপত্তা পাবে। জেনে রেখো, এ ভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। আমি এখান থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিতে চাই।[26]

উমর রা. বলেন, আমি রাসুল-কে বলতে শুনেছি:

---

[23] সহিহ বুখারি : ৩৪৬২

[24] মুসনাদু আহমাদ: ১৪১৫

[25] মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা: ৩৭৩৭

[26] সাহিহুল জামি:৭৯৮৬

لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

আমি বেঁচে থাকলে ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের অবশ্যই আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে ছাড়ব।

এ বিধান বিশেষভাবে আরব উপদ্বীপের জন্য; সারা পৃথিবীর জন্য তো অনুরূপ মর্যাদা মিলবে না। এ থেকে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো, রাসুল চেয়েছিলেন মুসলিমরা পৃথিবীতে উন্নত একটি ইসলামি জীবন কাটাবেন, যেখানে অমুসলিম সম্প্রদায় বা সংস্কৃতির কোনো ছোঁয়া থাকবে না।

জারির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেছেন:
আমি এমন মুসলিমদের দায় নিই না, যারা মুশরিকদের মধ্যে বাস করে। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, কেন? রাসুল বললেন, দুই দল এত দূরবর্তী হবে যে, একে অপরের আগুন দেখবে না।[27]
অতএব বোঝা যায় যে, মুসলিমদের জন্য কাফিরদের সাথে বসবাস করা ঠিক নয়। অবশ্য, কেউ সেখানে থাকতে বাধ্য হলে তাঁর জন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, যেমনঃ মুসলিম বন্দী।[28]

মুসলিম অমুসলিমের সহাবস্থানের বিধান

রাসুল যে পথ দেখিয়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয়, সামাজিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন এবং অনৈসলামিক সংস্কৃতি থেকে মুসলিম সমাজকে নিরাপদ রাখা আবশ্যক। এজন্য কোনো অনৈসলামিক রাষ্ট্রে সুযোগ থাকলে মুসলিমদের আলাদা অঞ্চলে ইসলামি ধাঁচে চলা ও বংশরক্ষার জন্য একে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এমনটা না হলে প্রয়োজনে যেখানে সম্ভব সেখানে বসবাসের সুযোগ রয়েছে।

মিশ্রিত আবাসস্থলে থেকে ইসলামি চরিত্র ও কীর্তি দিয়ে অমুসলিমদের প্রভাবিত করাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রথমত, এখন সে পর্যায়ের উন্নত চরিত্রের অধিকারী মুসলিম সাধারণভাবে নেই, যাঁদের দ্বারা অমুসলিমদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারত। আল্লামা ইকবালের ভাষায় মুসলিমদের অবস্থা আজ এমন:

---

[27] সহিহ তিরমিজি: ১৬০৪।

[28] মোল্লা আলী কারি: ৪/৫৫

"ভূষণে তোমরা নাসারার মতো, চালচলনে হিন্দুপ্রায়- মুসলিমের আজ এমন হাল, ইয়াহুদিরাও লজ্জা পায়।"

তাই এমন মুসলিমদের থেকে ইসলামের খিদমত আশা করা যায় না। এ অবস্থায় মুসলিমদের আলাদা ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া আরও বেশি জরুরি, যেন ইসলাম ও পূর্বসূরিদের দুর্নাম না হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি চরিত্র ও সভ্যতা থেকে অমুসলিমদের প্রভাবিত করার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল সাহাবিদের যুগে। কিন্তু তখনো মুসলিমদের চালচলন যেন অমুসলিমদের চেয়ে নিশ্চিতভাবে আলাদা থাকে, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, শরিয়তের নীতি হলো: ক্ষতি দূর করা লাভ করার চেয়ে অগ্রগণ্য।

একই ভূখণ্ডে যদি মুসলিম ও অমুসলিম বাস করে এবং ইসলামি চালচলনের দ্বারা অমুসলিমদের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে উলটো অনৈসলামিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা যেন না থাকে। ভারতের মতো দেশে ফিতনার সময়ে মুসলিমদের সুরক্ষিত থাকাটা সহজ ব্যাপার নয়। দাঙ্গা বাধলে সাম্প্রদায়িক কোনো বিভেদ গোপন রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, অথচ তা গোপন রাখা জরুরি।

উপর্যুক্ত কারণগুলো মাথায় রেখে আমি বলব, মুসলিমদের যদি আলাদা আবাসস্থল থাকে, সম্ভব হলে সেখানে বসবাসকে পছন্দের শীর্ষে রাখা উচিত। আর এমন না হলে মিশ্র-বসতির এলাকায় বসবাস মুসলিমদের জন্য অবৈধ নয়। বরং ঠিকভাবে ইসলাম পালন করা মুসলিম মিশ্র-বসতির এলাকায় থাকলে আশা করা যায় যে, সচ্চরিত্র দ্বারা অমুসলিমদের প্রভাবিত করা যাবে। সাহাবিদের জীবনচরিত এর বড় দৃষ্টান্ত।

অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের মাপকাঠি

অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রেখে চলা ও লেনদেন করতে ইসলাম বাধা দেয় না। ইসলাম একটি মানবিক ধর্ম- ধর্মাঞ্চলে জবরদস্তির পক্ষপাতী নয়। ইসলাম তাই অমুসলিমদের সামাজিকভাবে বয়কট করে না বা তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তোলে না, তাদের অধিকার নষ্ট করারও অনুমতি দেয় না। মানবিক ও নাগরিক সকল অধিকার নিশ্চিত করে। কেউ কেউ

কুরআনের এ আয়াতটির ভুল অর্থ করে থাকেন, যেখানে অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে বাধা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ٢٨

মুমিনরা যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এমনটা করবে, আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে তাদের দ্বারা তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তাদের সঙ্গে সাবধানে চলবে। [সুরা আলে ইমরান: ২৮]

এ ধরনের আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট দেখলে জানা যায়, এই বিধান যুদ্ধ ও দাঙ্গার সময়ের জন্য। আর তা এমন অমুসলিমদের জন্য, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করতে তৎপর। এ অবস্থায় যেকোনো ধর্ম ও জাতি শত্রুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ আবশ্যক মনে করে। পবিত্র কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে এ অবস্থা ও শত্রুদের চক্রান্তের দিকে ইঙ্গিতও রয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ٥١

হে মুমিনরা, তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অন্যের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ জালিমদের হিদায়াত করেন না। [সুরা মায়িদা: ৫১]

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ط فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ط ٥٢

যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তুমি তাদেরকে শীঘ্রই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে দেখবে এই বলে- আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ের আশঙ্কা হয়। আল্লাহ হয়তো বিজয় বা তার থেকে এমন কিছু দেবেন, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সেজন্য অনুতপ্ত হবে। [সুরা মায়িদা: ৫২]

এসব আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কাদের কোন অবস্থায় নিজেদের সঙ্গী ও সাহায্যকারী বানানো নিষিদ্ধ এবং এর উদ্দেশ্য কী। লক্ষণীয়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো জাতি বা ব্যক্তি নিজের আদর্শ ও ধর্ম নিয়ে উপহাসকারী লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে সম্মত হবে না।

পবিত্র কুরআনে কয়েকটি আয়াতে অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন ও সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি আয়াত খুবই স্পষ্ট :

لَا يَنۡهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيۡنَ لَمۡ يُقَاتِلُوۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوۡكُمۡ مِّنۡ دِيَارِكُمۡ اَنۡ تَبَرُّوۡهُمۡ وَ تُقۡسِطُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ ٨
اِنَّمَا يَنۡهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيۡنَ قَاتَلُوۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ وَاَخۡرَجُوۡكُمۡ مِّنۡ دِيَارِكُمۡ وَظَاهَرُوۡا عَلٰٓى اِخۡرَاجِكُمۡ اَنۡ تَوَلَّوۡهُمۡ‌ۚ وَمَنۡ
يَّتَوَلَّهُمۡ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ٩

ধর্ম নিয়ে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্ম নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, স্বদেশ থেকে তোমাদের তাড়িয়েছে বা তাড়াতে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারা জালিম। [সুরা মুমতাহিনা : ৮-৯]

কুরআনের এসব আয়াত পূর্ণ প্রেক্ষাপটসহ যে জানবে, সে কখনো ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত হবে না। ইসলাম মানবতার প্রতিরূপ এবং প্রত্যেকের সঙ্গে তার সীমানা অনুযায়ী সম্পর্ক রাখার অনুমতি দেয়। তবে শর্ত হলো, ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদায় চির ধরে বা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী কিছু যেন তাতে না থাকে।

অমুসলিমদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ

সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরস্পরের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করতে হয়। শরিয়তবিরোধী কিছুতে না জড়ানোর শর্তে ইসলাম এর অনুমতি দেয়। খোদ রাসুল ﷺ অমুসলিমদের সেবায় অংশ নিয়েছেন। সহিহ বুখারি ও সুনানু আবি দাউদে আনাস রা. বর্ণিত হাদিসে আছে :

এক ইয়াহুদি বালক রাসুল ﷺ -এর খিদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসুল ﷺ তার সেবা করতে যান। তার মাথার পাশে বসে বলেন, তুমি মুসলিম হয়ে যাও। ছেলেটি সেখানে উপস্থিত থাকা তার বাবার দিকে তাকাচ্ছিল। লোকটি ছেলেকে বলল, আবুল কাসিমের কথা মেনে নাও। সে মুসলিম হয়ে গেল। রাসুল ﷺ সেখান থেকে বেরোনোর সময় বলছিলেন, আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি আমার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।[29]

কোনো কোনো আলিম এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ইচ্ছা এবং দাওয়াত কবুল হওয়ার আশা থাকলে সেবা করা যেতে পারে।

ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি নাসারাদের সেবা করাকে নিঃশর্তে বৈধ বলেছেন, এভাবে অগ্নিপূজকের সেবা করারও অনুমতি দিয়েছেন। তবে এতে কারও কারও ভিন্নমতও রয়েছে।[30] তাঁর মতে, কোনো ইয়াহুদী বা নাসারার আত্নীয় মারা গেলে, শোক প্রকাশ করা হবে এভাবে- মৃত্যু একটি অনিবার্য বিষয়, মহান আল্লাহ আপনাকে যেন এর চেয়ে উত্তম বদলা দান করেন; ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, বিপদে ধৈর্য ধরুন।

অমুসলিমদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

অমুসলিমদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বিধান কী? মৃত অমুসলিম ব্যক্তি কোনো মুসলিমের নিকটাত্মীয় হলে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দায়িত্ব নিতে পারে এমন কেউ তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ না হয়ে থাকলে, সেই মুসলিমের পক্ষে ওই মৃত অমুসলিম ব্যক্তির সৎকারে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন জায়িজ আছে। প্রাজ্ঞ আলিমদের বক্তব্য থেকে এটাই শরিয়তের বিধান বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিধানের উৎস হলো আবু তালিবের মৃত্যুর ঘটনা।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর আলি রা. রাসুল ﷺ -কে সংবাদটি জানান। নবিজি ও তখন আলিকে তাঁর বাবার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার আদেশ দেন। কারণ, আলি রা. তার ছেলে তথা নিকটাত্মীয় ছিলেন। এ বর্ণনা বহু গ্রন্থে বিভিন্নভাবে এসেছে।[31]

[29] সহিহ বুখারি : ১৩৫৬

[30] আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ির: ৩৫১

[31] নাসবুর রায়াহ: ২/২৮১

হানাফি ফকিহ ও অধিকাংশ আলিম আবু তালিবের কাফন-দাফন সম্পর্কিত হাদিসটিকে মূল ধরে সে অনুযায়ী এ বিধান বর্ণনা করেছেন যে, নিকটাত্মীয় মারা গেলে কাফন-দাফনে যাওয়া যেতে পারে। অবশ্য যদি অন্য কোনো নিকটাত্মীয় থাকে, তাহলে অংশগ্রহণ না করা সতর্কতার পরিচায়ক।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে রাসূল (স) কে কোনো মুশরিকের কবরে যেতে বা তাদের শেষকৃত্যে শরিক হতে নিষেধ করেন।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنۡهُمۡ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمۡ عَلٰى قَبۡرِهٖ ؕ

তাদের কারও মৃত্যু হলে তার জন্য কখনো নামাজ পড়বে না, তুমি তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। [সুরা তাওবা: ৮৪]

তাফসিরু জালালাইনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এভাবে:

وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ لِدَفْنٍ أَوْ زِيَارَةٍ

দাফন বা জিয়ারতের জন্য তুমি তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না।[32]

আল্লামা জাসসাস রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন:

قَالَ عُلَمَاؤُنَا : هَذَا نَصٌّ فِي الِامْتِنَاعِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْكُفَّارِ

আমাদের আলিমরা বলেন, এ আয়াতে স্পষ্টভাবে কাফিরদের জানাজা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।[33]

এ থেকে প্রমাণিত হয়, প্রয়োজন ছাড়া অমুসলিমদের সৎকারে শরিক হওয়ার অনুমতি নেই, বিশেষ করে যখন সেখানে অনৈসলামিক বা খারাপ কাজ করা হবে। তাই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মুসলিমদের জন্য প্রয়োজন ছাড়া এর অনুমতি নেই।

অমুসলিমদের উপহার আদান-প্রদানের বিধান

সাধারণভাবে সৎ উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের উপহার আদান-প্রদান করা জায়িজ। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম। রাসুল ﷺ থেকে এ ব্যাপারে উভয় ধরনের কর্মপন্থা

[32] তাফসিরু জালালাইন: ১/১৬৪।

[33] আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন: ৮/১৪০।

বর্ণিত আছে। তিনি কয়েকজন অমুসলিমের উপহার গ্রহণ করেছেন, আবার কারও কারও উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেমন:

১. পঞ্চম হিজরির কথা, তখনো মক্কাবাসী মুসলিমদের ওপর আক্রমণের জন্য নিজেদের অভিযানের সংবাদ পাঠায়নি। রাসুল ﷺ তাদের মন জয় করতে আমর ইবনু উমাইয়া জামারিকে চিঠির সঙ্গে আজওয়া খেজুর দিয়ে আবু সুফিয়ানের কাছে পাঠান, নিজেও তার কাছ থেকে কিছু উপহার পেতে চান বলে জানান। আবু সুফিয়ানও কিছু জিনিস উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেন।[34]

কোনো কোনো উপহার তিনি প্রত্যাখ্যানও করেছেন। যেমন:
১. আবু বারা আমির ইবনু মালিক ইবনু জাফর, যার উপাধি ছিল মুলাইবুল আসিন্না, রাসুল ﷺ -এর কাছে উপহার হিসেবে একটি ঘোড়া পাঠায়। নবিজি এই বলে সেটা ফিরিয়ে দেন যে, إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ - আমাকে মুশরিকদের উপহার গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[35]

কোনো কোনো উপহার তিনি ফিরিয়ে দেননি, তবে নিজে ব্যবহার না করে অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। যেমন:
২. হিরাক্লিয়াস রাসুল ﷺ কে কিছু দিনার উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেকে মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। রাসুল ﷺ তখন তাবুকযুদ্ধে ছিলেন। তিনি তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়ে তার দেওয়া উপহার উপস্থিত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।[36]

আলিমরা রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত পরস্পরবিরোধী এই ঘটনাগুলোর সমতা বিধান করেছেন দুইভাবে:
শারহুস সিয়ারিল কাবির: ১/৭০; আল-মাবসূত, সারাখসি: ১০/১২; আল- ওয়াসাইকুস সিয়াসিয়া: ৭৬।

১. যার ব্যাপারে তিনি অনুভব করেছেন যে, সে ধারণা করছে রাসুল ﷺ -এর সব যুদ্ধ ও প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কেবল সম্পদ অর্জন করা, তার উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর যার ব্যাপারে এমনটা মনে হয়নি, তার উপহার রেখে দিয়েছেন।

---

[34] কিতাবুল আমওয়াল: ৬৩১

[35] আর-রাওজুল আনফ: ২/৩২১

[36] তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির ৪২০

২. যে অমুসলিমের উপহার নিলে তা ধর্মীয় শক্তির ঘাটতি বলে বিবেচিত হতো, তার উপহার প্রত্যাখ্যান করে দিতেন। যার ব্যাপারে এমনটা মনে হতো না, তার উপহার গ্রহণ করতেন।[37]

ফকিহরা এসব বর্ণনাকে সামনে রেখে এ মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, অমুসলিমদের উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রে কুফরির বিপরীতে যদি ইমানের মর্যাদাহানির শঙ্কা জাগে, তাহলে তার উপহার গ্রহণ করা যাবে না।[38]

এ মাসআলাও এখান থেকে উদ্ধৃত যে, যদি অমুসলিমদের উপহার গ্রহণের উদ্দেশ্য হয় তাদের মন জয় করা এবং এর ফলে তাদের ইসলাম ও মুসলিমদের নিকটবর্তী হওয়ার আশা থাকলে উপহার গ্রহণ করা জায়িজ; অন্যথায় নয়।[39]

এ বিধান সাধারণ পরিস্থিতির জন্য, অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন উপহার গ্রহণ করা এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী জায়িজ।

অমুসলিমদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ

অমুসলিমদের নিমন্ত্রণ করার বিধানও তাদের সঙ্গে উপহার আদান-প্রদানের মতোই। নিজের ইমানি শক্তি হ্রাসের আশঙ্কা না থাকলে অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করা এবং তাদের দাওয়াত করা যাবে। তবে একে অভ্যাসে পরিণত করা ঠিক হবে না।

এর পক্ষে দলিল হলো, রাসুল খায়বারে থাকাকালে এক ইয়াহুদির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার দেওয়া মাংস খেয়ে নেন, এটা কার জবাই করা তা না জেনেই।[40]

ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে রয়েছে :

وَأَكَلَ مَعَ الْكُفَّارِ وَابْتَلَى بِهِ الْمُسْلِمُ لا بَأْسَ لَوْمَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَأَمَّا الدَّوَامُعَلَيْهِ مَكْرُوهُ

[37] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৩/৪৮১-৪৮২।
[38] ফাতওয়া হিন্দিয়া: ৫/৩৫৯।
[39] ফাতহুল বারি: ৫/১৭১।
[40] আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস: ২/৩৯৪।

মুসলিমরা প্রয়োজনে অমুসলিমদের সঙ্গে দুই-একবার খাবার খেলে সমস্যা নেই, তবে একে অভ্যাসে পরিণত করা মাকরুহ।[41] এভাবে সাধারণ অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে কখনো কখনো অমুসলিমদেরও দাওয়াত করা যেতে পারে। ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে এটাও রয়েছে:

لا بأس بأن يُضِيفَ كَافِرًا لِقِرَابَةٍ أَوْ لحاجة

আত্মীয়তা রক্ষার্থে বা প্রয়োজনে কোনো অমুসলিমকে নিমন্ত্রণ করা জায়িজ। তবে, এ বৈধতা শুধু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য।[42]

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে উপহার পাঠানো

হিন্দুদের দেওয়ালি ও হোলি, খ্রিস্টানদের বড়দিন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে যে উপহার বা নিমন্ত্রণ আসে, সে ব্যাপারে করণীয় কী?

সাহাবি ও সালাফে সালিহিন থেকে এ ব্যাপারে দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন, আলি ইবনু আবি তালিব রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, কোনো এক অমুসলিম তাঁর কাছে নওরোজ দিবসের (রোম বা ইরানের নববর্ষের প্রথম দিন) উপহার পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করেন।

মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবায় বর্ণিত আছে, এক নারী আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর কাছে এসে বলল, অগ্নিপূজকদের সঙ্গেঙ্গ আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে তারা তাদের ধর্মীয় উৎসবের সময় আমাদের উপহার দেয়। আয়েশা বললেন, সেদিন যে পশু জবাই করা হবে তার গোশত বা গোশত-মিশ্রিত কিছু দিলে তা খাবে না। তবে, ফল বা এমন কিছু হলে খেতে পারো।[43]

আবু বারজা আসলামি রা. থেকে বর্ণিত, অগ্নিপূজকেরা তাঁর প্রতিবেশী ছিল এবং তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিল। নওরোজ ও মেহেরজান (পারস্যের উৎসবের দিন) উভয় দিবসে তারা উপহার পাঠাত। তিনি পরিবারের লোকেদের বলতেন, ফল ইত্যাদি খেয়ে নাও, বাকিগুলো ফিরিয়ে দাও।

---

[41] ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া: ৫/৩৫৯।

[42] হিন্দিয়া: ৫/৩৪৭।

[43] ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম, ইবনু তাইমিয়া: ১২০।

আল্লামা আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লি জাখিরাতুল ফাতাওয়ার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, এর দ্বারা উৎসবের সময়ে অমুসলিমদের উপহার গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলে মনে হয়। তাঁর কথাটি এমন :

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةَ كَافِرٍ فِي يَوْمِ عِيْدٍ وَلَوْ قُبِلَ لَا يُعْطِيهِمْ وَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهِمْ

কাফিরদের উৎসবের সময় তাদের উপহার গ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য অনুচিত। গ্রহণ করলেও এর বদলে কোনো উপহার দিতে যাওয়া বা তা পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।[44]

في يوم عيد-এর প্রয়োগ মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের উৎসবের দিনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে জাখিরা গ্রন্থের বক্তব্যে কিছুটা ছাড় রয়েছে। এ দুয়ের সামঞ্জস্যবিধান এভাবে করা যেতে পারে যে, ধর্মীয় আনন্দের অনুষ্ঠানে দুইভাবে উপহার আসে। কোনোটি মূর্তি বা দেবতাকে উৎসর্গ করে তারপর উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, যাকে প্রসাদ বলে। এটা গ্রহণ করা জায়িজ না হওয়ারই কথা। কারণ, مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ অর্থাৎ এটাও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হয়। জাখিরার বক্তব্যের উদ্দেশ্যও এটাই।

তবে কোনো কোনো খাদ্য বা জিনিস প্রসাদের জন্য নয়, বরং এমনিই তৈরি করা হয় লোকেদের মধ্যে বণ্টন করা বা বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য। এ ধরনের উপহার গ্রহণ করা যেতে পারে। ইবনু তাইমিয়া ও থানবি রাহ-এর ফাতওয়াও এটাই বলে।

আগের মতামত ও ব্যাখ্যা থেকেও শরিয়তের বিধান এটিই প্রতীয়মান হয় যে, অমুসলিমদের ধর্মীয় উপহার গ্রহণ করা নিরাপদ সময়ে ও অবস্থাসাপেক্ষে জায়িজ। উপহারের অবস্থা যদি সায় না দেয় বা অমুসলিমদের ইচ্ছা ও কাজের ওপর আস্থা না থাকে, তাহলে গ্রহণ করা অনুচিত। ধর্মীয় উপহার মূর্তির জন্য উৎসর্গিত হয়ে থাকলে গ্রহণ করা জায়িজ নয়, তা না হলে জায়িজ।

অমুসলিমদের উৎসবে উপহার দেওয়া

জাখিরাতুল ফাতাওয়ায় উল্লিখিত শাখাগত মাসআলা থেকে জানা যায়, অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের সময় তাদের উপহার দেওয়া জায়িজ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সাধারণভাবে তো

[44] ফাতাওয়ায়ে আবদুল হাই ১/৪০৩।

উপহার দেওয়া যাবেই না, উপহারের বদলেও কিছু দেওয়া ঠিক হবে না। ইবনু তাইমিয়া তাঁর ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিমে লিখেছেন:

“কোনো খ্রিষ্টানকে উৎসবের সময়ে উপহার দেওয়াকে আল্লামা ইবনুল কাসিম মাকরুহ বলেছেন, হোক তা উপহারের প্রতিদানে বা আলাদা উপহার হিসেবে। আলাদাভাবে দেওয়া তো আরও জঘন্য মাকরুহ, কেননা এর মাধ্যমে তাদের উৎসবের প্রতি সম্মান দেখানো এবং কুফরি কাজে এক ধরনের সহায়তা করা হয়। অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের সময় তাদের উৎসবের উপযোগী কিছু বানিয়ে দেওয়া মুসলিমদের জন্য জায়িজ নয়, যেমন তাদের উৎসবে গোশত-তরকারি ইত্যাদি বিক্রি করা বা নিজের বাহন তাদের ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি। কারণ, এর দ্বারা তাদের কুফর ও শিরকের প্রতি সম্মান দেখানো এবং কুফরির কল্যাণে সহায়তা করা হয়। অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের এ ধরনের অংশগ্রহণে মুসলিম শাসকদের বাধা দেওয়া উচিত। ইমাম মালিকসহ অনেক আলিমের মত এটিই। এতে কারও ভিন্নমত পাওয়া যায় না।”

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

উপরের আলোচনা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা- অর্চনা কিংবা উৎসব-পার্বণে শরিক হওয়া বা প্রতিনিধিত্ব করা মুসলিমদের জন্য জায়িজ নয়। আমর ইবনু মুররা لَا يَشْهَدَوْنَ الزور-এর তাফসিরে লিখেছেন :

لَا يُمَاكِثُونَ أَهْلَ الشَّرْكِ عَلَى شِرْكِهِمْ وَلَا يُخَالِطُوْنَهُمْ

মুশরিকদের শিরকি কাজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাবে না এবং তাদের সঙ্গে কোথাও একত্রে থাকা যাবে না।[45]

আতা ইবনু ইয়াসার রাহ. বলেন, উমর রা. বলেছেন :

إِيَّاكُمْ وَأَنْ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ عِيْدِهِمْ فِي كَنَاءِ سِهِمْ

তোমরা মুশরিকদের উৎসবে তাদের ইবাদতখানায় প্রবেশ করা থেকে বিরত থেকো।[46]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন :

---
[45] ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম, ইবনু তাইমিয়া: ৮৬।

[46] প্রাগুক্ত: ৯৬।

مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ، فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّىيَمُوْتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে অমুসলিমদের বস্তিতে ঘর বানায়, তাদের নওরোজ ও মেহেরজান উৎসবের মতো উৎসব করে এবং তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে আর এমন অবস্থায় মারা যায়, কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গেই তার হাশর হবে।[47]

এসব হাদিস ও আসার থেকে অনুমিত হয়, অমুসলিমদের ধর্মীয় মেলায় তাদের সম্মান জানানো বা তাদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ জায়িজ নয়। এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যাপকার্থক হাদিস দিয়েও দলিল পেশ করা হয়, যেগুলোতে গুনাহের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকে গুনাহের কাজ বলা হয়েছে।

একইভাবে অমুসলিমদের উৎসব উপলক্ষ্যে তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করাও জায়িজ নয়। কারণ, এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের শিরকি সংস্কৃতি ও উৎসবকে সম্মান জানানো হয়ে যায়। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে এমন পরিস্থিতিতে সুকৌশলে তাদের উৎসবের ব্যাপারে যা না বললেই নয় এমন কথাবার্তা সতর্কতার সঙ্গে বলা যেতে পারে-যার দ্বারা তাদের মন সন্তুষ্ট হয়ে যায়, অন্যদিকে তাদের উৎসবকেও সম্মান জানানো হয় না।

ইসলামি অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের অংশগ্রহণ

ইসলামি আচার-অনুষ্ঠান যেমন ইদ, রমজানের ইফতার ইত্যাদিতে অমুসলিমদের অংশগ্রহণ করা জায়িজ কি না, এ ব্যাপারে ফকিহদের বক্তব্যে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। তবে কুরবানির গোশতের ব্যাপারে তাঁরা বলেছেন, এটা অমুসলিমদের দেওয়া যাবে।

ইমাম গাজালি রাহ. হাসান বসরির মত বর্ণনা করে বলেন, তিনি প্রতিবেশী ইয়াহুদি বা নাসারাদের কুরবানির গোশত খাওয়ানোর অনুমতি দিয়েছেন।[48]

এর ওপর অনুমান করলে মনে হয়, যদি অমুসলিমদের জন্য ইফতার বা ইদের ভোজসভায় পানাহারের পৃথক ব্যবস্থা করা হয় এবং মুসলিমদের সঙ্গে মেশানো না হয়, তাহলে এর অবকাশ

[47] ইলাউস সুনান: ১২/৭০২-৭০৩।

[48] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ২/২৩৩।

আছে। ইফতার ইত্যাদির সময় অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। এটি ইবাদতেরই অংশ। এমন মুহূর্তে কুফরির সংস্পর্শ থেকে কেনো না কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। তাই সেদিকে লক্ষ রাখা জরুরি।

এ বর্ণনা থেকে এটাও অনুমিত হয় যে, অমুসলিমদের পক্ষ থেকে যে ইফতারপার্টি করা হয়, তাতে অংশ নেওয়া মূলত নাজায়িজ নয়, তবে এর দ্বারা ইফতারের পবিত্র উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য তা মাকরুহ, আর প্রায়শ এমনটা করা গুনাহের কাজ বটে।

অমুসলিমদের ইবাদতখানা নির্মাণ ও নকশা করা

পারস্পরিক সুসম্পর্কের ভিত্তিতে যদি অমুসলিমরা ইচ্ছা করে যে, মুসলিম কোনো প্রকৌশলী তাদের উপাসনালয়ের নকশা করে দেবেন অথবা মুসলিম শ্রমিকরা তা নির্মাণ করে দেবেন, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর মতে তা জায়িজ আছে। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট মাসআলা রয়েছে:

وَلَوِ اسْتَأْجَرَ الذِّى مُسْلِمًا لِيَبْنِي لَهُ بِيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً جَازَ وَيَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ

যদি কোনো অমুসলিম কোনো মুসলিমকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের গির্জা বা মঠ নির্মাণ করে দিতে নিয়োগ করে, তাহলে তা জায়িজ এবং মুসলিমদের জন্য এর পারিশ্রমিকও হালাল।[49]

অমুসলিমদের থেকে চাঁদা নেওয়া

মসজিদ-মাদরাসা বা ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণের জন্য অমুসলিমদের থেকে চাঁদা নেওয়া জায়িজ আছে। শর্ত হলো, তারা একে পুণ্যকর্ম মনে করে দান করবে, যা মসজিদ-মাদরাসা বা ধর্মীয় স্থাপনার উদ্দেশ্যের বিপরীত হবে না। ভবিষ্যতে যেন তারা মুসলিমদের এ নিয়ে খোঁটা না দেয় এবং এর বদলে নিজেদের ধর্মীয় স্থাপনায় মুসলিমদের চাঁদা দানের বাধ্যবাধকতা না থাকে। এসব শর্তে আলিমরা অমুসলিমদের থেকে চাঁদা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[50]
ফাতাওয়া শামিতে রয়েছে:

[49] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৪/৪৫০।

[50] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/৬৬৪, ৬৬৮; ৩/১২৯-১৩০।

وَأَنْ يَكُونَ) قُرْبَةً فِي ذَاتِهِ مَعْلُومًا فَتُعَيِّنُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي وَقْفِ الْمُسْلِمِ فقط، بخلاف الدي لِمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ أَنَّ شَرْطَ وَقْفِ الدُّيَّ أَنْ يَكُونَ قرْبَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى مَسْجِدِ الْقُدْسِ

(যেজন্য চাঁদা তোলা হবে তা) মূলত সাওয়াবের কাজ হতে হবে। এটা কেবল মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জিম্মিদের (যেসব কাফির মুসলিম রাষ্ট্রে কর দিয়ে বাস করে) জন্য নয়। যেমন আল- বাহরুর রায়িক ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে যে, জিম্মির ওয়াকফের জন্য শর্ত হলো, তা আমাদের ও তাদের কাছে ইবাদত হতে হবে। যেমন, ফকিরকে দান বা বায়তুল মাকদিসে ওয়াকফ করা।[51]

এ ক্ষেত্রে পুণ্যকর্ম বলে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ওয়াকফকারীর ধর্ম বিবেচ্য।[52]

অমুসলিমদের উপাসনালয়ের জন্য মুসলিমদের চাঁদা দেওয়া জায়িজ নয়। যদি এ আশঙ্কা থাকে যে, অমুসলিমরা ভবিষ্যতে তাদের ইবাদতখানার জন্য চাঁদা চাইবে, তাহলে তাদের চাঁদা নেওয়াও জায়িজ হবে না- যদিও সে সৎকর্ম মনে করে তা দিয়ে থাকে।

পতাকার সম্মানে মাথা নোয়ানো

অমুসলিম দেশে এমন আরও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যাকে অন্যান্য জাতি কেবল রাজনৈতিক এবং জাতীয় বিষয় মনে করে। কিন্তু মুসলিমদের জন্য এটা তাঁদের ধর্মীয় বিষয়।

বর্তমানে অধিকাংশ দেশে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রচলন রয়েছে। এটা করার সময় কারও বসে থাকাকে বেআদবি বা রাষ্ট্রীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

এ বিষয়ে দেওবন্দি আলিমদের দুটি মত পাওয়া যায় :

১. ফুলওয়ারি শরিফ পাটনি থেকে প্রকাশিত মাসিক ম্যাগাজিন নকিবে মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রাহ.-এর একটি ফাতওয়া প্রকাশিত হয়। তাঁর ফাতওয়ার সারকথাটি এমন : 'পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলিম লিগও করে এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রেও তা করা হয়। এটা একটা জাতীয় বিষয়, যাতে সংশোধনী আনা প্রয়োজন। কিন্তু একে ঢালাওভাবে মুশরিকদের কাজ বলা ঠিক হবে না।[53]

---

[51] ফাতাওয়ায়ে শামি: ৩/৩৬০।

[52] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/৬৬৮।

[53] নাকিব: ৭/২৬-জুমাদাল উলা: ১৩৫৮ হিজরি-৯ জুলাই ১৯৩৯।

সমকালীন কোনো কোনো আলিমও এই মতই গ্রহণ করেছেন।[54]
অবশ্য কেউ কেউ পতাকার সামনে সোজা দাঁড়িয়ে থাকাকে জায়িজ বলেছেন আর হাত জোড় করা বা মাথা নত করাকে বলেছেন নাজায়েয।[55]
থানবি রাহ. ইমদাদুল ফাতাওয়ায় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'উজালায়ে কাশফুল হিজাব আন মাসআলাতি তাজিমি বা'জিল আনসাব।' তিনি তাঁর ফাতওয়ায় একে নাজায়িজ ও অনৈসলামিক কাজ বলে মন্তব্য করেছেন এবং এর পক্ষে দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। আমরা চিন্তা করলে দেখব যে, এই মতটিই যথেষ্ট শক্তিশালী। এর কিছু কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. একটি দেশের পতাকাকে সেই দেশের জাতীয় পরিচিতি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার নিদর্শন মনে করা হয়। এজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের পতাকা পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। এসব পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ধরন অনেকটা উপাসনার আদলের কাছাকাছি। যেমন এর চারপাশে লোকেরা দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গায় এবং এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য প্রকাশ করে। একে তারা তাদের দেশের মর্যাদার প্রতীক মনে করে এবং এর সামনে উপাসনাসুলভ অনুরাগ এবং অর্ঘ্য পেশ করে। সেই মুহূর্তে কারও বসার অনুমতি নেই। সম্মান প্রদর্শনের দিন-সময়ও নির্ধারিত করা হয়।

এসব ব্যাপারে গবেষণা করলে বোঝা যায়, বর্তমানে পতাকা হচ্ছে যেন সর্বোচ্চ

রাজনৈতিক উপাস্য, যাকে কুরআনের ভাষায় 'আনসাব' বলা হয়েছে। আনসাবের ব্যাখ্যায় মুফাসসিররা বলেছেন:

وَالْأَنْصَابُ : وَهِيَ الْأَصْنَامُ الْمَنْصُوْبَةُ لِلْعِبَادَةِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْأَنْصَابِ وَالْأَصْنَامِ بِأَنَّ الْأَنْصَابَ حِجَارَةٌ لَمْ تُصَوَّرُ، كَانُوا يَنْصِبُوْنَهَا لِلْعِبَادَةِ وَيَذْبَحُوْنَ عِنْدَهَا ، وَالْأَصْنَامُ مَا صُوِّرَ وَعُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَز وَجَل

আনসাব হলো যা উপাসনার জন্য স্থাপন করা হয়। কেউ কেউ 'আনসাব' ও 'আসনাম'-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন 'আনসাব' হলো এমন পাথর যা মূর্তি নয়, একে ঘিরে লোকেরা উপাসনা করে এবং এর বেদিতে পশু জবাই করে। অন্যদিকে 'আসনাম' হলো এমন প্রতিকৃতি বা মূর্তি, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করা হয়।[56]

---

54 ফাতাওয়ায়ে রাহিমিয়া

55 মওজুদা জামানাকে মাসাইল কা শরই হল, বুরহান সাম্বলি: ১৩৫।

56 রুহুল মাআনি: ৭/১৫।

জাতীয় পতাকাকে ঘিরে ভারতে 'বন্দে মাতরম' আর বাংলাদেশে 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়া হয়। 'বন্দে মাতরম'-এর অর্থ হলো মাতৃভূমিকে বন্দনা করি। এভাবে সংগীত পরিবেশন ও পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হয় এবং এর দ্বারা আনুগত্য ও ভক্তির নজরানা পেশ করা হয়। ফলে আনসাবের বৈশিষ্ট্য এতে অংশত দৃষ্ট হয়। আর আনসাবের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বিধান স্পষ্ট। আল্লাহ বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡاَنۡصَابُ وَالۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

হে মুমিনরা, মদ, জুয়া, প্রতিমা (আনসাব) ও ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ হলো শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এসব থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারো। [সুরা মায়িদা: ৮৯]

২. অনৈসলামিক দেশের পতাকাও অনৈসলামিক হয়ে থাকে এবং সেই পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আমাদের ফকিহরা অমুসলিমদের সালাম করার যে নীতি বর্ণনা করেছেন, তা সামনে রাখলে এই রীতিও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। অমুসলিমকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সালাম দেওয়া জায়িজ নয়। কোনো কোনো ফকিহ একে কুফরি পর্যন্ত বলেছেন। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে সালাম দেওয়া যেতে পারে। তাতে এমন বাক্য ব্যবহার করতে বলেছেন, যা দ্বারা তার প্রতি সম্মান দেখানো হয় না। যেমন:

سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

যে সৎ পথ অনুসরণ করে, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।[57]

গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায়, অমুসলিমদের পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করা বা এর জন্য স্থায়ী নিরাপত্তা চাওয়া জায়িজ নয়। কারণ, জিম্মির দীর্ঘায়ু ও চিরসুখের জন্য দুআ করা জায়িজ নয়।[58]

পতাকার জন্য সম্মান দেখানোটা সংশয়পূর্ণ। আনসাব হোক বা না, কোনোভাবেই সম্মাননীয় নয়, তাই দাঁড়ানো জায়িজ হবে না। তবে সরকারি চাকরিজীবী বা এমন কেউ যে পতাকার সামনে দাঁড়াতে বাধ্য, না দাঁড়ালে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তার জন্য অনীহা নিয়ে দাঁড়ানো বৈধ হতে

[57] ফাতাওয়ায়ে শামি: ৯/৫৯০।

[58] ফাতাওয়ায়ে বাজ্জাজিয়া ৬/৩৫৫।

পারে। পতাকাকে সম্মান করার মাসআলার এ বিশ্লেষণ ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানোর সঙ্গে তুলনীয়।

বন্দে মাতরম বা এমন সংগীত পরিবেশনের বিধান

যে সংগীতে শিরকি কথা মেশানো থাকে, তা পতাকার সামনে বা অন্য কোথাও পরিবেশন করা জায়িজ নয়। যেমন ভারতের জাতীয় সংগীত বন্দে মাতরম-এ শিরকি বিষয় রয়েছে। 'বন্দে মাতরম' অর্থ 'মাতৃভূমির বন্দনা করি'। ফারসি ভাষার শব্দ, এসেছে সংস্কৃত থেকে। দুটো ভাষাই 'আরিন' গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই উচ্চারণে পার্থক্য থাকলেও কয়েকটি স্থানে শব্দগত ও অর্থগত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, 'আস্প' অর্থ সাপ, 'অষ্টমি' অর্থ হশতম (অষ্টম) ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে জন্মস্থানের পূজা করার চল রয়েছে, যেমন 'ব্রহ্মাণ্ডপূজা' বা 'ভূমিপূজা'। এসব দ্বারা প্রমাণিত হয়, 'বন্দে মাতরম' অর্থাৎ 'মাতৃভূমির বন্দনা করি' এটা কার্যতও একটা শিরকি ব্যাপার, কোনো মুসলিমের জন্য এটা উচ্চারণ করা জায়িজ নয়। এজন্য স্বাধীনতার পর থেকে সব যুগের আলিমরা এর বিরোধিতা করে আসছেন, এর বাধ্যবাধকতা থেকে মুসলিমদের বাদ দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবিও উত্থাপন করছেন। তা ছাড়া এ সংগীতে কয়েকটা শব্দের অর্থ অজানা, আর অর্থ না জানা শব্দ উচ্চারণ করা জায়িজ নয়। কারণ, তাতে শিরকি ও কুফরি কিছু থাকতে পারে।[59]

থানবি রাহ.-এর সময়ে জাতীয় সংগীত ছিল অন্যটি, তবু তিনি এ সংশয়ের দিকটি বিবেচনা করে বলেছেন তখনকার জাতীয় সংগীত গাওয়াও জায়িজ নয়।[60] ভারতের জাতীয় সংগীতে হিন্দুদের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা এর জায়িজ না হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্ষতির আশঙ্কাবশত যে এটা গাইতে বাধ্য, তার জন্য মনে অসন্তুষ্টি রেখে এটা গাওয়ার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ١٠٦

কেউ তার ইমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ইমানে অবিচল। [সুরা নাহল: ১০৬]

---

[59] শারহুল মুসলিম, ইমাম নববি: ২/২১৯।

[60] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৪/৬৪৭।

এ থেকে বোঝা যায়, আত্মরক্ষার্থে 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণের অনুমতি রয়েছে, যদিও না করাটা দৃঢ়তার পরিচায়ক।

পারস্পরিক বিবাদে অনৈসলামিক আদালতের ফায়সালা

অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হলো, পারস্পরিক বিবাদ আদালতে গিয়ে মীমাংসা করা। আদালত সেই দেশের প্রচলিত আইন ও সাক্ষ্যের নীতির ভিত্তিতে রায় দিয়ে থাকে। সেসব আদালতের নীতি ইসলামি নীতিমালার আলোকে ভুল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশ্ন হলো, পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দল যদি আদালতের কোনো রায়কে ভুল বলে জানে এবং তারা মুসলিম হয়, তাহলে তাদের জন্য এই রায় থেকে উপকৃত হওয়া জায়িজ কি না।

আবু হানিফা রাহ.-এর ফিকহ অনুযায়ী, যে মামলায় বিচারকের স্বাধীনতা রয়েছে তার ফায়সালা থেকে উপকৃত হওয়া জায়িজ। আর যে মামলা বিচারকের কর্তৃত্বের বাইরে, সেটার ফায়সালা থেকে উপকৃত হওয়া জায়িজ নয়। কিছু ক্ষেত্রে কারও কোনোকিছুর মালিকানার স্পষ্ট কারণ থাকে না, যেমন, কেউ নিজেকে কোনো জমি বা স্থাবর সম্পদের মালিক বলে দাবি করল। ধরা যাক এমন মামলায় আদালত বাদীর পক্ষে রায় দিয়ে দিল, যদিও সে প্রকৃত মালিক নয়। এ ক্ষেত্রে আদালতের ফায়সালার কারণে সম্পদটি বাদীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না, বরং সে মুসলিম হলে আল্লাহর ভয়ে প্রকৃত মালিককে সেটি ফিরিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য।

কিছু ক্ষেত্রে মালিকানার স্পষ্ট কারণ থাকে, যেমন কেউ কোনো বস্তুকে ক্রয়সূত্রে নিজের বলে দাবি করল। কিংবা বিষয়টি বিয়ে ও তালাক সম্পর্কিত। এ অবস্থায় আদালতের রায় কার্যকর হবে, তা ভুল হলেও। রায় যার পক্ষে যাবে, বস্তু বা অধিকার তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। ফিকহের পরিভাষায় একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়-মামলায় বিচারকের রায় জাহিরি (বাহ্যিক) ও বাতিনি (বাস্তবিক) উভয়ভাবে কার্যকর হয়, নাকি কেবল জাহিরিভাবে? এ নিয়ে বহুকাল ধরে ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য চলে আসছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর মতটি আল্লামা কাসানি রাহ. এভাবে উল্লেখ করেছেন:

“কোনো মামলায় বিচারকের কর্তৃত্ব থাকলে আদালতের ফায়সালা থেকে উপকৃত হওয়া জায়িজ। এটা আবু হানিফার মত। মামলা বিচারকের কর্তৃত্বের বাইরে হলে, সর্বসম্মতিক্রমে আদালতের

ফায়সালা থেকে উপকৃত হওয়া জায়িজ নয়।”[61]

ইসলামে সাংস্কৃতিক ঐক্যের কোনো অবকাশ নেই

মুসলিম উম্মাহ সকল জাতির ভিড়েও স্বকীয় পরিচয় বহন করে থাকে। শক্তিমত্তা বা দুর্বলতা যা-ই থাকুক না কেন, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ না করা মুসলিমদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের এই বৈশিষ্ট্য নেই। তাদের জাতীয় ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম কখনো শক্তিশালী উপাদান হিসেবে ছিল না।

কালিসার (খ্রিষ্টানদের একটি দল, যারা মেরি তথা মারইয়ামের পূজা করত) যুগকে ধর্মীয় যুগ বলা হয়, কিন্তু তাদের কঠোরতা কল্যাণের বদলে অকল্যাণই করেছে বেশি। তা ছাড়া ওই সময়ের ব্যাপ্তি এতই কম ছিল যে, একে গোনায় ধরা হয় না।

যেসব অপশক্তির কাছে উম্মাহর এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পীড়াদায়ক, তারা চায় মুসলিমদের জীবন ধর্মহীন হয়ে যাক। তাই তারা নানা রকমের অপকৌশল অবলম্বন করছে ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিশ্বায়নের নামে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও ঐক্যের আন্দোলনও তাদের এ অপকৌশলেরই অংশ। তারা এমন ঐক্য গড়তে বলে, যেখানে কোনো ধর্মের অস্তিত্বই থাকবে না। তারা এমন সম্প্রীতির কথা বলে যে, সবাই মিলে কাজ করব আর সকল ধর্মের ভালো ভালো কাজ ও শিক্ষার সমন্বয়ে একটি সম্মিলিত মানবধর্ম গড়ে তোলা হবে। তারা এ-ও বলে, সব ধর্মই তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তাই পথ ভিন্ন হলেও গন্তব্য তো একটাই।

ইতিহাস আমাদের বলে, সাংস্কৃতিক ঐক্য ও বিনিময়ের এই প্রচারণা নতুন নয়। সব যুগেই কাফিররা কামনা করে এসেছে, ইমানদাররা তাদের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে সাংস্কৃতিক ঐক্যের নামে তাদের দলে নাম লেখাবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَدُّوۡا لَوۡ تَكۡفُرُوۡنَ كَمَا كَفَرُوۡا فَتَكُوۡنُوۡنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡهُمۡ اَوۡلِيَآءَ

তারা চায় তোমরাও তাদের মতো কাফির হয়ে যাও। [সুরা নিসা: ৮৮।

[61] বাদাইউস সানাইঃ ৫/৪৫৮।

এমন ঐক্য ইসলামে পরিত্যাজ্য, যা ইসলাম থেকে আমাদের টেনে বের করে কুফরির দিকে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় শয়তানের পথে ও জাহান্নামের দিকে। দয়াময় প্রভুর জান্নাত ছেড়ে জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা তো অবশ্যই বর্জনীয়। পবিত্র কুরআন আমাদের সতর্ক করে দেয়, মানবেতিহাসের প্রত্যেক যুগেই এমন সংস্থা ছিল, তারা একই সূত্রে গাঁথা।

মূর্তি একেক কালে একেক রকমের হয়ে থাকে। যেমনই হোক না কেন, মূর্তি তো মূর্তিই। কুরআন বলে, ইসলামের আবির্ভাবের আগে পুরো মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল। নবি- রাসুলগণ এই ঐক্য মানবসভ্যতার সংস্কার ও উন্নতির জন্যই ভেঙেছেন। কাজেই আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে নবি-রাসুলদের শিক্ষা আমাদের মধ্যে থাকার পরও মূর্খতার যুগের সেই ভুল ঐক্য আমরা পুনরায় ফিরিয়ে আনব! কুরআনের বাণী :

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

সকল মানুষ ছিল একই জাতি। তারপর আল্লাহ নবিদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। [সুরা বাকারা: ২১৩]

আন্তঃধর্মীয় ঐক্য ও নব্য সংস্কৃতির স্লোগান ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তের অংশ, এসবের প্রতি ঝুঁকে পড়া নিঃসন্দেহে অনৈসলামিক কাজ।

নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণের নাম ইসলাম

পবিত্র কুরআন যে বিধানগুলো দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছে, মুসলিমদের সেগুলো বেশি গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলা উচিত। যেমন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَـكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ٢٠٨

হে ইমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও, এবং শায়ত্বনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [সুরা বাকারা: ২০৮]

এ আয়াতের ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে তাকালে আলোচ্য বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইয়াহুদি থেকে মুসলিম হওয়া আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ও আসআদ ইবনু উবায়েদ প্রমুখ চিন্তা

করলেন, ইসলাম গ্রহণের পরও আগের ধর্মের কিছু বিধান পালন করা যেতে পারে, যেগুলো ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। অথচ কেবল ইসলাম গ্রহণ করলে হচ্ছে না, এ আয়াতে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে, যেন এর সঙ্গে অন্য কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের চিহ্নও না থাকে। এমন আরও একটি পটভূমির দিকে আমরা তাকাতে পারি। উমর রা. তাওরাতের একটি কপি নিয়ে রাসুল-এর সামনে এলে তিনি বললেন (তাঁর কথার কঠোরতা ও ক্রোধ অনুমান করুন):

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْعَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي

সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ-যদি তোমাদের সামনে মুসা আসেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করো, তোমরা পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে। বিশ্বাস করো, যদি মুসা জীবিত থাকতেন আর আমি নবি হতাম, তাহলে তিনি আমাকে অনুসরণ করতেন।[62]

এখানে ইমানের দৃঢ়তা ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের দিকটি প্রণিধানযোগ্য, যা রাসুলী- এর অসন্তুষ্টির পর উমর রা. প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ، رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِدِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا
আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অসন্তুষ্টি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি। আল্লাহ আমাদের প্রভু, আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আমি ইসলাম ও নবি মুহাম্মাদ-এর প্রতি সন্তুষ্ট।[63]

এ ছাড়াও রাসুল বিভিন্ন সময়ে অমুসলিমদের বিরোধিতা করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, এর সারকথা হলো সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ এড়িয়ে চলা আবশ্যক। আমাদের বোঝা উচিত, নিজের রঙে রঙিন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলাম কীভাবে অনৈসলামিক সংস্কৃতির মিশ্রণ মেনে নিতে পারে!

---

[62] মুসনাদু দারিমি: ৪৩৫।

[63] মিশকাতুল মাসাবিহঃ ৩২।

অমুসলিমদের বিবাদের ক্ষেত্রে মুসলিমদের করণীয়

অমুসলিমদের পারস্পরিক যুদ্ধ ও ঝগড়া-বিবাদে মুসলিমদের প্রথমত মীমাংসাকারীর ভূমিকা নেওয়া উচিত। স্থানীয় বিবাদ দূর করে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কোনো কারণে এমন ভূমিকা নেওয়া না গেলে অন্তত জালিমদের বদলে মজলুমদের পক্ষে অবস্থান নিতে হবে, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে। কোন পর্যায় পর্যন্ত জালিমদের বিপরীতে নিরীহদের সঙ্গে থাকা যাবে, এটা দেশ ও জাতির অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। পরিস্থিতি সায় দিলে মজলুমদের সঙ্গে থাকতে হবে। মুসলিমরা নিরীহ লোকেদের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচার বন্ধ করা বা ন্যায়বিচারের পথ বের করার মতো অবস্থানে যদি থাকে, তাদের অবশ্যই তা-ই করতে হবে, যেমনটা হাবশায় জুবায়ের রা. করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির ওপর মুসলিমদের প্রভাব না খাটলে অত্যাচারিতদের পক্ষে দাঁড়ানো যাবে না। নিরীহ লোকেদের সহায়তা করতে গেলে যদি মুসলিমদের প্রাণ ও মান হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সরাসরি লড়াই করার বদলে তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হতে হবে। এমন ক্ষেত্রে মক্কায় অবস্থানকালে রোম ও পারস্যের যুদ্ধে রাসুল ﷺ ও সাহাবিদের কর্মপন্থা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। জানমাল ঝুঁকিতে ফেলে অত্যাচারের বা গুনাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সাওয়াব ও ফজিলতের কাজ হলেও, শর্ত হলো, যে প্রতিবাদ করবে তাকে আগে নিজের ব্যাপারে ভালো করে জানতে হবে। নিজের ওপর যেসব পরীক্ষা আসতে পারে, সেগুলো নিয়ে ভেবে করণীয় ঠিক করতে হবে। এসব বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মজলুম লোকদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া যাবে এমন সময়, যখন সঙ্গে থাকা লোক শক্তিশালী হবে। তা না হলে নিজেদের সুবিধা ও নিরাপত্তা বুঝে সেদিকে পা বাড়াতে হবে।

ভারতের মুসলিমদের বর্তমানে এই সামর্থ্য নেই যে, কারও প্রতি স্পষ্টভাবে সমর্থন জানাতে পারবেন। অন্যদের সহায়তা করা পরের ব্যাপার, তাদের আগে নিজেদের জানমালের সুরক্ষা নিয়ে ভাবা উচিত।

দুরবস্থায় থাকা অমুসলিমদের সহায়তা

সৃষ্টির সেবা করা ইসলামে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মনুষ্যত্বের দাবিতেই ইসলাম মানুষের সেবা করার নির্দেশ দেয়। মানুষ তো বটেই, প্রাণীর সেবাকেও ইসলাম পুণ্যের কাজ সাব্যস্ত করেছে। রাসুল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে :

إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا

চতুষ্পদ প্রাণীর সেবায়ও সাওয়াব রয়েছে?

রাসুল ﷺ বলেছেন:

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرُ

প্রত্যেক প্রাণীর সেবায়ই সাওয়াব রয়েছে।[64]

ইসলাম সাধ্যমতো সকল মানুষের সেবা করার নির্দেশ দেয়। ইসলাম মুসলিমদের মানুষ হিসেবে অমুসলিমদের কেবল সহযোগিতার অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এতে উৎসাহও প্রদান করে।

আসমা রা. বলেন, কুরাইশের সঙ্গে চুক্তি চলাকালে মুশরিক থাকা অবস্থায় আমার মা আমার কাছে এলেন। আমি রাসুল ﷺ -কে তা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব এবং তাঁকে সহায়তা করতে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[65]

এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বাণী:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং স্বদেশ থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। [সুরা মুমতাহিনা : ৮]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও আবু হুরায়রা রা. উভয়ে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন:

الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

[64] কিতাবুল খারাজ: ১৬।

[65] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৪১৮-৪১৯।

সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। কেউ তাঁর পরিবারের যেকোনো সদস্যের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে সে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠবে।[66]

এমন অনেক হাদিস রয়েছে, যেগুলো মানুষ হিসেবে সব সৃষ্টির সেবা করতে আমাদের উৎসাহিত করে। এজন্য যদি মুসলিমরা সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্যে কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণের উদ্যোগ নেয়, তাহলে অমুসলিমদের মধ্যে ত্রাণ পাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। দ্বিগুণ সম্পর্কের ভিত্তিতে মুসলিমরা অবশ্যই অগ্রগণ্য, তবে সুযোগ থাকলে অমুসলিমদেরও কিছু অংশ দিতে হবে-বিশেষ করে ভারতের মতো রাষ্ট্রে, যেন অমুসলিমদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতি সুধারণা সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। এ সময় কোনো উগ্রপন্থী দল যদি মুসলিমদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদের কার্যকলাপ তাদের জন্য, আমরা ইসলামের উন্নত বৈশিষ্ট্য কখনো ছাড়তে পারব না। পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এটা আমাদের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দেয়,

যে আত্মীয়তা রক্ষা করে না তার সঙ্গেও আমরা আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখব। যে আমাদের ওপর অত্যাচার করে, তাকে আমরা ক্ষমা করে দেবো। যারা আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, আমরা তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব।

আবু সুফিয়ান রা. মুশরিক থাকাকালে রাসুল ﷺ এর কাছে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মুক্তির জন্য দুআর আবেদন করেছিলেন। রাসুল ﷺ তাতে সাড়া দিয়ে তাদের জন্য দুআ করলেন। কারণ খাবার একটি মৌলিক মানবিক প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে পার্থক্য করা বাঞ্ছনীয় নয়।

সুমামা ইবনু উসাল রা. মক্কাবাসীকে খাদ্য পৌঁছে দিতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। মক্কাবাসী রাসুল ﷺ এর কাছে এসে সুপারিশ করার আবেদন করল। নবিজি সুমামাকে নির্দেশ দিলেন, যেভাবে আগে খাদ্য দেওয়া হতো এখনো সেভাবে দেওয়া হোক।[67]

অতএব মুসলিমদের সঙ্গে অমুসলিমদের ব্যবহার যেমনই হোক, মুসলিমদের জন্য নিজেদের ইসলামি চরিত্র ও আদর্শ ছেড়ে দেওয়া কখনোই সমীচীন নয়।

---

[66] সুনানু বায়হাকি : ৭৪৪৮; ইবনু হিব্বান: ২/২৩৮; ইবনু আদি: ৬/৩৪০।

[67] মুসনাদু আহমাদ: ২/২৪৮; আল-ওয়াসাইকুস সিয়াসিয়া: ৭৫-৭৬।

গ্রন্থপঞ্জি ও কৃতজ্ঞতা

অমুসলিম দেশে মুসলমান: মুফতি আখতার ইমাম আদিল কাসিমি

আল কাউসার

মুসলিম বাংলা

আইওএম এর পাঠ্যক্রম

ifatwa.info

Al-Quran App (Greentech Apps Foundation)